Rmtp

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চাষ পদ্ধতি



"উচ্চ মূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ"
শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ

IFAD
Investing in rural people

EMBASSY OF DENMARK

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চাষ পদ্ধতি



অধ্যাপক ডঃ মোঃ জাহিদুর রহমান
বি, এস-সি, এজি (অনার্স) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, এম, এস (উদ্যানতত্ত্ব), পিএইচডি (জাপান), প্রটেক্টেড চাষে বিশেষ ট্রেনিং (জাপান)
উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিকেএসএফ
IFAD
Investing in rural people
EMBASSY OF DENMARK

প্রকাশনায়

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০।

ফোন ঃ +৮৮-০১৭৩৩-২০৯২৩৩

ই-মেইল ঃ esdobangladesh@hotmail.com

ওয়েবসাইড ঃ www.esdo.net.bd

ফেসবুক ঃ www.facebook.com/esdobangladesh

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২৫ ইং

প্রকাশনা উপদেষ্টা মন্ডলী

ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

মোঃ রফিজুল ইসলাম মন্ডল, সেক্টর ভ্যালু চেইন স্পেশালিষ্ট (হর্টিকালচার), আরএমটিপি, পিকেএসএফ

জেসমিন আরা, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), আরএমটিপি, পিকেএসএফ

এস এস আর এম মাহে আলম সরওয়ার, ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরএমটিপি, পিকেএসএফ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

ড. সেলিমা আখতার, পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও

প্রণয়নে

অধ্যাপক ডঃ মোঃ জাহিদুর রহমান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

সহযোগিতায়

মোঃ আইনুল হক, ফোকাল পার্সন, RMTP-উচ্চ মূল্যের ফল-ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ, ইএসডিও।

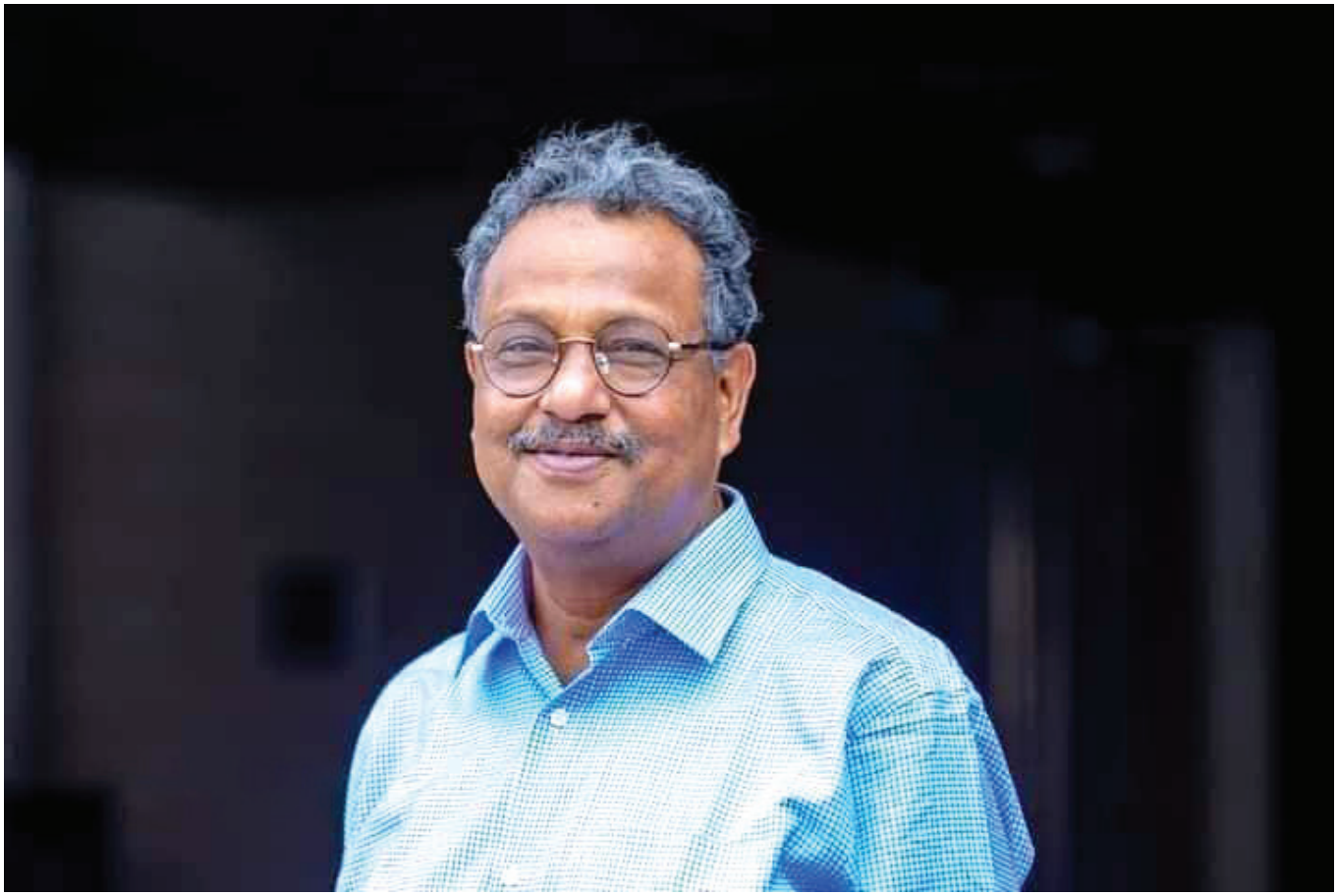
কল্যাণ মহান্ত, প্রজেক্ট ম্যানেজার, RMTP-উচ্চ মূল্যের ফল-ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ, ইএসডিও।

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)





ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইএসডিও

পুষ্টি নিরাপত্তায় খাদ্য তালিকায় ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া আধা-উষ্ণ প্রকৃতির হলেও সাব ট্রপিক্যাল অঞ্চলের অনেক উচ্চ মূল্যের ফল-ফসল যেমন-অ্যাভোকাডো, লংগান, লোকাট, কাজুবাদাম, রাম্বুতান, কমলা, কফি ইত্যাদির চাষ খুব একটা লক্ষ করা যায় না। বিশ্বে মোট উৎপাদিত প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন ট্রপিক্যাল ফলের মধ্যে প্রায় ৫০% এশিয়ায় উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে বিভিন্ন ট্রপিক্যাল ফল উৎপাদন ও রপ্তানিতে এগিয়ে রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটির ধরন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যের এসব ফল চাষ তেমন লক্ষ করা যায় না।

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), ড্যানিডা এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)-এর আওতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ২০২২ সাল থেকে ৩ বছর মেয়াদি "উচ্চ মূল্যের ফল-ফসলের জাত সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলার সদর ও তেঁতুলিয়া উপজেলার ৬ হাজার কৃষক পরিবারের মাঝে উচ্চ মূল্যের ফল-ফসল চাষ সম্প্রসারণের জন্যে কারিগরি সহায়তা ও উৎকৃষ্ট মানের বিভিন্ন ফল-ফসলের চারা বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ সারাবিশ্বে ফল উৎপাদনে ১০ম, কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, আম উৎপাদনে ৭ম এবং পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম। তবে দেশীয় ফল জাতীয় পর্যায়ে চাহিদার মাত্র ৩০% যোগান দিতে পারে। ফলের এ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২-৩ হাজার কোটি টাকার ফল আমদানি করতে হয়।

দেশের জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এর মূল লক্ষ্য হলো নিরাপদ, লাভজনক কৃষি এবং টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করা। বাংলাদেশে প্রচলিত ফল ছাড়াও ট্রপিক্যাল ও সাব-ট্রপিক্যাল অঞ্চলের নানাবিধ ফল, সবজি ও মশলা জাতীয় ফসল চাষ করার বিশাল এক সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে খোরপোশ কৃষির স্বল্প বিনিয়োগ, স্বল্প কর্মকাণ্ড, স্বল্প আয় এবং স্বল্প ভোগের পরিবর্তে উচ্চ বিনিয়োগ, বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড, উচ্চ আয় এবং উচ্চ ভোগের কৃষি ব্যবস্থা প্রচলন করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বাণিজ্যিক কৃষির প্রচলন করা গেলে কর্মসংস্থান এবং খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে।

RMTP-এর আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩৫টি উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের চাষ পদ্ধতি নিয়ে "উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চাষ পদ্ধতি" নামক বইটি প্রকাশনার জন্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই বইটি প্রকল্পের সদস্যসহ অন্যান্য কৃষকদের উচ্চ মূল্যের ফল-ফসল চাষের কারিগরি নানা বিষয় জানতে ও বুঝতে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সকলের কল্যাণ ও মঙ্গল হোক।



সূচিপত্র

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	পৃষ্ঠা নং
ফল জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতি		০৮
১	আম	১০
২	লিচু	১৫
৩	আনারস	২০
৪	মিষ্টি তেঁতুল	২৩
৫	সফেদা	২৭
৬	শরীফা	৩০
৭	খেজুর	৩৩
৮	জি - ৯ কলা	৩৮
মসলা জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতি		**৪২**
৯	তেজপাতা	৪৩
১০	দারুচিনি	৪৭
১১	গোলমরিচ	৫০
১২	এলাচ	৫৩
১৩	লেমন গ্রাস	৫৬
১৪	ভ্যানিলা	৫৮
১৫	আলু বোখারা	৬১
১৬	চুঁইঝাল	৬৪
লেবু জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতি		**৬৬**
১৭	বাতাবি লেবু	৬৭
১৮	সিডলেস লেবু	৭১
১৯	কমলা	৭৪
২০	মাল্টা	৭৮
সাব-ট্রপিক্যাল অঞ্চলের জনপ্রিয় ফল-ফসলের চাষ পদ্ধতি		**৮১**
২১	অ্যাভোকাডো	৮২
২২	পিচ	৮৫
২৩	কিউই	৮৮

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	পৃষ্ঠা নং
২৪	ম্যাঙ্গোস্টিন	৯১
২৫	পার্সিমন	৯৪
২৬	লোকাট	৯৭
২৭	লংগান	১০০
২৮	স্ট্রবেরি	১০৩
২৯	প্যাসন ফল	১০৭
৩০	রাম্বুতান	১১০
৩১	ব্লু-বেরি	১১৩
৩২	কফি	১১৫
৩৩	কাজুবাদাম	১১৮
৩৪	ম্যাকাডেমিয়া বাদাম	১২১
৩৫	ফলের কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা	১২৩
৩৬	উদ্যান ফসলে আইওটি বেইজড স্মার্ট প্রযুক্তি	১২৫
৩৭	ফল হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য তৈরির পদ্ধতি	১২৭







ফল জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতি



১। আমের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: আম
ইংরেজি নাম: Mango
বৈজ্ঞানিক নাম: *Mangifera indica* L.

ভূমিকা

আম গ্রীষ্মকালীন অঞ্চলে জন্মানো এক ধরনের সুস্বাদু ফল। আম সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় এত পছন্দনীয় ফল পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এমন কোন জাতি নেই যারা আম পছন্দ করেন না। তাই একে সম্মান দিয়ে ফলের রাজা বলা হয়। কাঁচা অবস্থায় আমের রং সবুজ এবং পাকা অবস্থায় হলুদ হয়ে থাকে। ধারণা করা হয়, আম প্রায় সাড়ে ৬০০বছরের পুরোনো। আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আমের চাষ হয়। জলবায়ু ও মাটির অধিক উপযোগিতার কারণে উৎকৃষ্ট মানের আম উৎপাদন প্রধানত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে এসব অঞ্চলের বাইরে অন্যান্য জেলাতেও বাণিজ্যিক-ভাবে আম উৎপাদন শুরু হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আমের মোট উৎপাদন প্রায় ১২.৮৮ লক্ষ মে. টন।

ঔষধিগুণ

পুষ্টিবিদদের মতে, আমের শাঁস থেকে আঁটি পুরোটাতেই রয়েছে নানাবিধ উপকারিতা। আম খেলে শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমে। এছাড়া হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই ফল। আম রক্তে উপস্থিত খারাপ কোলেস্টরলের মাত্রা কমায়। আম হজম শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আম বাটা মাখলেও ত্বকে লোমের মুখগুলো খুলে গিয়ে ত্বক পরিষ্কার থাকে। চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি এবং রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা করে। আমে রয়েছে টারটারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড ও সাইট্রিক অ্যাসিড, যা শরীরের ক্ষার ধরে রাখতে সাহায্য করে। আমে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। গরমে প্রতিদিন একটি করে আম খেলে শরীরে শক্তি জোগান দিতে আমের জুড়ি নেই। আম পাতার ও বিস্ময়কর ঔষধি গুনাগুণ; যেমন- রক্তচাপ কমায়, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে, কান ব্যথা কমায়, পোড়া সারাতে ও কিডনির পাথর দূর করতে সাহায্য করে।

পুষ্টিগুণ

স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান ও ব্যবহার বৈচিত্র্যে আম তুলনাহীন। পাকা আমে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন 'এ' এবং খনিজ পদার্থ থাকে। ভিটামিন 'এ'-এর দিক থেকে আমের স্থান পৃথিবীর প্রায় সকল ফলের উপরে। USDA-এর তথ্য অনুযায়ী এক কাপ আমে নিম্নলিখিত উপাদান রয়েছেঃ ৯৯ কিলো ক্যালরি, ১.৪ গ্রাম প্রোটিন, ০.৬ গ্রাম চর্বি, ২৪.৮ গ্রাম শ্বেতসার, ২.৬ গ্রাম আঁশ, ৪৯ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন 'এ', ৭ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন 'কে', ৬০ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন 'সি' এবং ২৭৭ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম।

আমের জন্মস্থান

আমের জন্মস্থান নিয়ে রয়েছে নানা তর্ক-বিতর্ক। বৈজ্ঞানিক নাম Mangifera indica খ. নামের এ ফল ভারতীয় অঞ্চলের কোথায় প্রথম দেখা গেছে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আমাদের এ জনপদেই যে আমের আদিবাস এ সম্পর্কে আম বিজ্ঞানীরা একমত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭-এ আলেকজান্ডার সিন্ধু উপত্যকায় আম দেখে ও খেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ সময়ই আম ছড়িয়ে পড়ে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মাদাগাস্কারে। চীন পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩২ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ অঞ্চলে ভ্রমণে এসে বাংলাদেশের আমকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করেন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আফ্রিকায় আম চাষ শুরু হয়। এরপর ১৬ শতাব্দীতে পারস্য উপসাগরে, ১৬৯০ সালে ইংল্যান্ডের কাচের ঘরে, ১৭ শতাব্দীতে ইয়েমেনে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালিতে আম চাষের খবর জানা যায়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে প্রথম আমের আঁটি থেকে গাছ হয়। এভাবেই আম ফলটি বিশ্ববাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়।

জাত

পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ প্রজাতির আম আছে। আমের প্রায় কয়েক শত জাত রয়েছে। যেমনঃ ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসাপাত, অরুনা, আম্রপালি, মল্লিকা, সুবর্নরেখা, মিশ্রিদানা, নিলাম্বরী, কালীভোগ, কাঁচামিঠা, আলফানসো, বারোমাসি, তোতাপুরী, কারাবাউ, কেউই সাউই, গোপাল খাস, কেন্ট, সূর্যপূরী, পাহুতান, ত্রিফলা, হাড়িভাঙ্গা, ছাতাপরা, গুঠলি, লখনা, আদাইরা, কলাবতী আম, রূপালি ইত্যাদি।

বারি আমের জাতঃ

বারি আম-১ (মহানন্দা)ঃ 'বারি আম-১' প্রতি বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাত। আমের এই আগাম জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতার আকৃতি লম্বাটে। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৭০০-৮০০টি। হেক্টর প্রতি ফলন ১৫ টন।

বারি আম-২ ঃ 'বারি আম-২' প্রতি বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রঙিন উচ্চ ফলনশীল জাত। বারি আম-২ জাতটি মাঝ-মৌসুমী। হেক্টর প্রতি ফলন ২২ টন। জাতটি বাংলাদেশে সর্বত্রই চাষের উপযোগী।

বারি আম-৩ ঃ দেশের আম জগতে 'বারি আম-৩' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তন। পাকলে হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করে। প্রতি বছর ফলদানকারী নাবি জাত। হেক্টর প্রতি ফলন ২০ টন।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড আম)ঃ 'বারি আম-৪' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত । এটি নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল, মিষ্টি স্বাদের নাবি জাত। হেক্টর প্রতি ফলন ২০ টন।



বারি আম-৫ঃ 'বারি আম-৫' নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০ টন।

বারি আম-৬ঃ 'বারি আম-৬' একটি মধ্য-মৌসুমী জাত। হেক্টর প্রতি ফলন ১৬ টন।

বারি আম-৭ঃ 'বারি আম-৭' একটি রঙিন মাঝ মৌসুমী জাত। এটি সুস্বাদু, উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রং ও ভালো গুণাবলির জন্য এ জাতের আম বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৮ঃ 'বারি আম-৮' একটি নাবি জাত। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা) ঃ প্রতি বছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত সাত বছর **বয়সী** গাছে হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৩৫ টন। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

বারি আম-১০ ঃ উচ্চ ফলনশীল, মাঝ মৌসুমী জাত। প্রতি বছর নিয়মিত ফল ধরে। ১০-১২ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ২৯০টি ফল ধরে যার ওজন ৭২.৫ কেজি।

বারি আম-১১ ঃ বারোমাসি আমের জাত,যা বছরে তিনবার ফল প্রদান করে। ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও মাঘ মাসের ফল আহরণ উপযোগী হয়।

বারি আম-১২ঃ প্রতি বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অতি নাবি জাত 'বারি আম-১২'। ৬ বছর বয়সের প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৯৮ টি। হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৩ টন। অতি নাবি হওয়ায় এটি চাষ করে বেশ লাভবান হওয়া যায়।

মাটি
গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি
চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি
সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। এক বছর বয়স্ক সুস্থ্য, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণ করতে হবে।

চারা তৈরি
ক্লেফট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে চারা তৈরি করা যায়।

চারা রোপণের সময়
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর)।

চারা রোপণের দূরত্ব
প্রতি গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮ থেকে ১০ মিটার রাখতে হয়।

গর্ত তৈরি
গর্তের আকার ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার।

গর্তে সারের পরিমাণ
প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ: জৈব সার ২০-৩০ কেজি, টিএসপি ৪৫০-৫৫০ গ্রাম, এমওপি ২০০-৩০০ গ্রাম, জিপসাম ২০০-২৩০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৪০-৬০ গ্রাম।

সার প্রয়োগ
চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। একটি পূর্ণ বয়স্ক ফলন্ত আম গাছে বছরে ৫০ কেজি জৈব সার, ২ কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি টিএসপি, ৫০০ গ্রাম এমওপি, ৫০০ গ্রাম জিপসাম ও ২৫ গ্রাম জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথমবার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয়বার আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ
গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারার গোড়ায় মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে।

সেচ পদ্ধতি

চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় মুকুল বের হওয়ার ৩ মাস আগে থেকে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে ১ বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আবার ১ বার বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের পরিচর্যা

ডাল ছাঁটাইকরণঃ

গাছের প্রধান কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে ১ মিটার থেকে ১.৫ মিটার ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় শাখা কেটে ফেলতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা কেটে দিতে হয়।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন ঃ

কলম গাছের বয়স ৩ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

আন্ত ফসল চাষঃ

ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার

আম প্রাকৃতিকভাবে ঝরা বন্ধ হলেই ব্যাগিং শুরু করতে হবে। বারি আম-১, গোপালভোগ, খিরসাপাত, ল্যাংড়া, বারি আম-২, বারি আম-৬ এবং বারি আম-৭ জাতের ক্ষেত্রে ব্যাগিং করা হয় ৪০-৫৫ দিন বয়সে। এই সময়ে আম জাতভেদে মার্বেল আকারের বা এর চেয়ে বড় হয়ে থাকে। তবে বারি আম-৩, ৪, ৮, ফজলি, হাড়িভাঙ্গা, আশ্বিনা এবং গৌড়মতি আমের ক্ষেত্রে গুটির বয়স ৬৫ দিন হলেও ব্যাগিং করা যাবে। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ভালোভাবে মিশিয়ে শুধুমাত্র ফলে স্প্রে করতে হবে। ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা ঠিক নয়। আমের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি স্প্রে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন-প্রথমবার আম গাছে মুকুল আসার আনুমানিক ১৫-২০ দিন পূর্বে, দ্বিতীয়বার মুকুল আসার পর অর্থাৎ আমের মুকুল যখন ১০-১৫ সে.মি.লম্বা হবে কিন্তু ফুল ফুটবে না এবং আম যখন মটর দানার মতো হবে তখন তৃতীয়বার। সুতরাং এর পরপরই আমে স্প্রে করে ব্যাগিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যাগিং করার পূর্বেই মরা মুকুল বা পুষ্পমঞ্জুরির অংশ বিশেষ, পত্র, উপপত্র অথবা এমন কিছু যা ফলের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

ফল সংগ্রহ

গাছে কিছু সংখ্যক আমের বোঁটার নিচের ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে অথবা আধাপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরাম্ভ করে তখন আম সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। গাছ ঝাকি দিয়ে আম না পেড়ে ছোট গাছের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে এবং বড় গাছের ক্ষেত্রে জালিযুক্ত বাঁশের সাহায্যে আম সংগ্রহ করা ভালো।

ফল সংরক্ষণ

গরম পানিতে আম শোধনঃ গাছ থেকে আম সংগ্রহের পর পরই আম ৫২-৫৫০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৫-৭ মিনিট ডুবিয়ে শোধনের মাধ্যমে বোঁটা পচা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন করে আমের সংরক্ষণকাল অতিরিক্ত এক সপ্তাহ বাড়ানো যায় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ করা সম্ভব। গরম পানিতে আম শোধনের একটি যন্ত্র (হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা ও শোধনের সময় ঠিক রেখে প্রতি ঘণ্টায় ১ টন আম শোধন করা যায়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় প্রতি কেজি আমের শোধন খরচ ৪০-৫০ পয়সা।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

আমের হপার পোকা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন:

শোষক পোকা (হপার) এবং এ্যানথ্রাকনোজ রোগ আমের প্রধান শত্রু। বিভিন্ন পর্যায়ে এরা আমের ক্ষতি করে থাকে। তবে মুকুল অবস্থায় ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে শতভাগ ফসল বিনষ্ট হতে পারে। মুকুল আসার সময় শোষক পোকা (হপার) এবং এ্যানথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণে মুকুল ঝরে যায়।

প্রতিকারঃ পরাগায়ণ নিশ্চিত করতে হবে। আমের মুকুল এসেছে কিন্তু ফুল ফোঁটার পূর্বেই অর্থাৎ পুষ্পমঞ্জুরি ছড়ার দৈর্ঘ্য ৫-১০ সেমি হয় তখন প্রতি লিটার পানিতে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ/ফেনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি ১ মিলি এবং টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে একবার এবং তার এক মাস পর আম মটর দানার আকৃতি হলে আরেকবার গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

আমের ভোমরা পোকা দমন

আমের ভোমরা পোকার কীড়া আমের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায়। সাধারণত কচি আমে ছিদ্র করে এর ভিতরে ঢুকে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য বাইরে থেকে আমটি ভাল মনে হলেও ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। একবার কোন গাছে এ পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছটি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী গাছসমূহে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কলমের আম গাছে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকারঃ মুকুল আসার পূর্বে পৌষ-মাঘ মাসে সম্পূর্ণ বাগান বা প্রতিটি আম গাছের চারদিকে ৪ মিটারের মধ্যে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ভালোভাবে মাটি কুপিয়ে উল্টে দিলে মাটিতে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়। আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে। ফলের মার্বেল অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম/বাসাথ্রিন), ১০ ইসি মিশিয়ে গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।



২। লিচুর চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: লিচু
ইংরেজি নাম: Lychee
বৈজ্ঞানিক নাম: *Litchi chinensis Sonn.*

ভূমিকা

লিচু গন্ধ ও স্বাদের জন্য দেশ-বিদেশে বেশ জনপ্রিয়। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে লিচুর মোট উৎপাদন ৯০ হাজার টন। লিচু টিনজাত করে সংরক্ষণ করা যায়।

ঔষধিগুণ

লিচু শরীর ঠান্ডা রাখে। তৃষ্ণা মেটায় ও শরীরের বল বাড়ায়। পরিমিত খেলে শরীরের বায়ু, কফ ও পিত্ত নাশ করে। অত্যধিক ক্লান্তিতে বা দীর্ঘ রোগভোগের পর দুর্বলতায় প্রতিদিন চার-পাঁচটি লিচু সামান্য লবণ মিশিয়ে খেলে দারুণ উপকার পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের দুর্বলতায় স্মৃতিবিভ্রম ঘটলে ভুলো মন মানুষজন দিনে আট দশটা লিচু লবণ মিশিয়ে খেলে স্মৃতি স্বাভাবিক হয়। হৃদরোগী ও লিভারের রোগীদের পক্ষে লিচু উপকারী। মৌসুমের সময় দু-বেলা চার-পাঁচটি করে লিচু খেলে বয়স বাড়লেও শরীরে লাবণ্য বজায় থাকে। বোলতা, বিচ্ছু কামড়ালে পাতার রস ব্যবহার করা হয়। কাশি, পেটব্যথা, টিউমার এবং গ্যান্ডের বৃদ্ধি দমনে লিচু ফল কার্যকর। চর্মরোগের ব্যথায় লিচু বীজ ব্যবহৃত হয়। পানিতে সিদ্ধ লিচুর শেকড়, বাকল ও ফুল গলার ঘা সারায়। বাকল ও শিকড়ের ক্বাথ গরম পানিসহ কুলি করলে গলার কষ্ট উপশম হয়।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম লিচুতে রয়েছে-জলীয় অংশ ৮১.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, শর্করা ১৬.৫৩, চিনি ১৫.২৩ গ্রাম, আঁশ ১.৩ গ্রাম, চর্বি ০.৪৪ গ্রাম, আমিষ ০.৮৩ গ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.০১১ মি. গ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.০৬৫ মি. গ্রাম, ভিটামিন বি-৩ ০.৬০৩ মি. গ্রাম, ভিটামিন বি-৬ ০.১ মি. গ্রাম, ভিটামিন সি ৭১.৫ মি.গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫ মি.গ্রাম, লৌহ ০.১৩ মি. গ্রাম, জিংক ০.০৭ মি গ্রাম।

লিচুর জাত

অনেক জাতের লিচুর মধ্যে বেদানা, গুটি, মাদ্রাজি, বোম্বাই, মঙ্গলবাড়ী, মোজাফফরপুরী, চায়না-৩, কদমী সবচেয়ে ভালো। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) লিচুর জাত উদ্ভাবিত করেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হলঃ

'বারি লিচু-১'ঃ উচ্চ ফলনশীল জাত। এটি একটি আগাম জাত। প্রতি গাছে ৮-১০ হাজার ফল উৎপাদিত হতে পারে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

'বারি লিচু-২'ঃ উচ্চ ফলনশীল নারি জাত। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি গাছের ফলের সংখ্যা ২৩০০-২৭০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন।

'বারি লিচু-৩'ঃ জাতটি মাঝ মৌসুমী জাত, নিয়মিত ফল ধরে। ফলের শাঁস মাংসল রসালো ও খুব মিষ্টি। প্রতিটি গাছের ফলের সংখ্যা ১৬০০-২০০০টি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন।

'বারি লিচু-৪'ঃ জাতটি একটি মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৫,০০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

'বারি লিচু-৫'ঃ উচ্চ ফলনশীল নাবি জাত। প্রতিবছর ফল ধরে। ১৫ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ৩৪,০০টি ফল ধরে যার ওজন ৭৩.৮ কেজি।

জন্মস্থান/উৎস

লিচু দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কুয়াংতুং এবং ফুচিয়েন প্রদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ। সেখানে ১১শ শতক থেকে এর চাষাবাদ হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে।

মাটি

গভীর, নিকাশযুক্ত, উর্বর বেলে অথবা দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি

উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ প্রণালী

সমতল ভূমিতে-বর্গাকার ও পাহাড়ি ভূমিতে-কন্টুর পদ্ধতি।



চারা নির্বাচন

এক থেকে দুই বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটি কলমের চারা বাছাই করতে হবে।

চারা রোপণের সময়ঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) মাস।

চারা রোপণের দূরত্বঃ সারি থেকে সারির ও চারা থেকে চারার দুরত্ব ৮ মিটার।

গর্ত তৈরিঃ গর্তের আকার ১মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার।

গর্তে সারের পরিমাণঃ চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করতে হবে। গর্তে কিছুটা পুরাতন লিচু বাগানের মাটি মিশিয়ে দিলে চারার অভিযোজন দ্রুত বৃদ্ধি হবে।

গর্ত প্রতি সারের পরিমাণঃ টিএসপি ৫০০ গ্রাম, এমওপি ৪০০ গ্রাম, জিপসাম ২০০-৩০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৪০-৬০ গ্রাম, জৈব/গোবর ২০-২৫ কেজি।

চারা রোপণঃ গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	সারের নাম			
	১-৪	৫-১০	১১-২০	২০ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	২০০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪০০	১২০০	২০০০	৩০০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	১৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	২০	৩০	৫০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার শুরুতে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফুল আসার পর প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ

চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোঁটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মতো হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া একান্ত দরকার। অপরদিকে, বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে তার জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

পূর্ণ বয়স্ক গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের জন্য ফল সংগ্রহের পর অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। ফল সংগ্রহের সময় লিচুর মাকড় আক্রান্ত ডাল ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন

কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফল পাকার সময় খোসা আকর্ষণীয় খয়েরি, লাল বা সবুজ মিশ্রিত লাল রং ধারণ করে ও খোসার কাঁটাগুলি চ্যাপ্টা হয়ে সমান হয়ে যায়। মঞ্জুরির গোড়া থেকে পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে থোকায় থোকায় লিচু সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির পর পরই গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়। কারণ এতে ফল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল সংগ্রহের সময় ফলবান ও ফল বিহীন বিশেষ করে লিচু মাকড় আক্রান্ত পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে দিতে হয়। যথাযথ পরিচর্যা পেলে লিচু গাছ ১০০ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফল দিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচু গাছ থেকে বছরে ৫০০০-১০০০০ (১০০-১৫০ কেজি) লিচু সংগ্রহ করা যায়।

সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

লিচু পাকার পর পাতা ও বোঁটাসহ সম্ভব হলে কাচি বা সিকেচার দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। নষ্ট ও কাঁচা লিচু বাদ দিয়ে ভালো মানের ফল গোছা আকারে ঝুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ পাতা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোল্ড স্টোরেজের প্যাকিং কক্ষে আনতে হবে। এখানে আর একবার ফল বাছাই করতে হবে। ফলের সাথে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটার বোঁটা রেখে ছিদ্রযুক্ত পলিইথাইলিন ব্যাগে করোগেটেড ফাইবার কার্টুনে ভরে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২৪ ঘণ্টা রাখতে হবে। এভাবে ১ কেজি লিচুর জন্য ৪টি ব্যাগের প্রয়োজন। তারপর কার্টুনগুলো ঠান্ডাযুক্ত গাড়িতে করে রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে পাঠাতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

ফল ছিদ্রকারী পোকাঃ ফল ছিদ্রকারী পোকা লিচুর অন্যতম প্রধান শত্রু। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে খোসার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে বোঁটার নিকট দিয়ে ফলের ভিতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাঃ

- ❖ বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❖ আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ❖ পোকাদমনের জন্য রিপকর্ড/সিমবুশ/সুমিসাইডিন/ ডেসিস প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ❖ মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে শেষ স্প্রে করতে হবে।

লিচুর মাইট বা মাকড়ঃ লিচু গাছের পাতা, ফুল ও ফলে এর আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং এর নিচের দিকে লাল মখমলের মত হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে মরে যায়।

দমন ব্যবস্থাঃ

- ❍ ফল সংগ্রহের সময় মাকড় আক্রান্ত পাতা ডালসহ ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ❍ মাকড় নাশক ভারটিম্যাক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে নতুন পাতায় ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

লিচুর পরগাছা সমস্যাঃ পরগাছা গাছের গায়ে জড়িয়ে থেকে গাছের পুষ্টিতে ভাগ বসায় এবং বৃদ্ধি ব্যহত করে গাছের ক্ষতি করে ।

ব্যবস্থাপনাঃ

- ❍ ফুল আসার আগেই পরগাছা গাছ থেকে মূল/শিকড়সহ অপসারণ করে ধ্বংস করতে হবে।
- ❍ আক্রান্ত ডাল আপসারণ করতে হবে।

লিচুর পাতা মোড়ানো পোকাঃ এরা পাতা মুড়িয়ে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। বড় গাছের জন্য বেশি ক্ষতিকর না হলেও ছোট গাছকে অনেক সময় পত্রশুন্য করে ফেলতে পারে।

ব্যবস্থাপনাঃ

- ⊙ আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস ফেলতে হবে।
- ⊙ গাছের নিচে পড়ে থাকা পাতা ও আবর্জনা অপসারণ করতে হবে।
- ⊙ রাসায়নিক কীটনাশক সুপারিশকৃত নয় তবে আক্রমণ বেশি হলে প্রতিলিটার পানিতে সুমিথিয়ন ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বাদুরঃ লিচুর প্রধান শত্রু বাদুর। এরা পরিপক্ক ফলে আক্রমণ করে। ফল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় এক রাতের অসাবধানতায় এরা সমস্ত ফল বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। মেঘলা রাতে বাদুরের উপদ্রব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

দমন ব্যবস্থাঃ

- ❋ বাদুর তাড়ানোর জন্য রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ❋ সমস্ত গাছ জালের সাহায্যে ঢেকে দিয়েও বাদুরের আক্রমণ রোধ করা যায়।
- ❋ বাগানে গাছের উপর দিয়ে শক্ত ও চিকন সুতা বা তার টাঙ্গিয়ে রাখলে বাদুরের চলাচল বাঁধাগ্রস্ত হয়।

লিচুর ফল ঝরে যাওয়া সমস্যাঃ ফল ঝরা লিচুর সাধারণ সমস্যা। আবহাওয়া শুষ্ক হলে বা গাছে হরমোনের অভাব থাকলে ফল ঝরে পড়তে পারে। গুটি অবস্থায় ফল ঝরতে পারে। ফল বাদামি থেকে কালো রং ধারণ করে।

ব্যবস্থাপনাঃ

- ❖ শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- ❖ ফল মটর দানা এবং মার্বেল আকার অবস্থায় ম্যাগনল প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।
- ❖ গুটি বাধার পর ম্যাকচিলি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩-৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে ।

লিচুর ফল ফেটে যাওয়াঃ রোগটি দেখা দিলে লিচু চাষিরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। বিভিন্ন কারণে লিচুর ফল ফেটে যাওয়া রোগটি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চাষকৃত লিচুর জাতগুলোর মধ্যে বোম্বাই লিচুতে ফল ফেটে যাওয়া রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। সাধারণত আগাম জাতের লিচুতে ফল ফেটে যাওয়া সমস্যাটি বেশি দেখা যায়। দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ বৃষ্টি, শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ার ফলে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। বেলে,দোঁআশ বা পলি মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক কম বিধায় এই ধরনের মাটিতে লিচু বাগান হলে ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়াও লিচু বাগানের মাটিতে বোরণ ও ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলে এই রোগের দ্রুত বিস্তার হয়ে থাকে।

ফল ফাটা রোগের প্রতিকারঃ

- ✪ লিচু গাছে বছরে ৩ কিস্তিতে অর্থাৎ বর্ষার শুরুতে, বর্ষার শেষে এবং শেষ কিস্তি গাছে ফুল আসার পর গাছের বয়স অনুসারে পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার সুষম মাত্রায় দিতে হবে।
- ✪ খরা মৌসুমে ফল ধারার পর থেকেই ১০-১৫ দিন পর পর লিচু গাছে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। সেচ প্রদানের পর প্রয়োজনে গাছের গোড়ায় কচুরিপানা বা খড় দ্বারা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ✪ প্রতি বছর প্রতি গাছের গোড়ায় ক্যালসিয়াম সার (ডলোচুন ৫০ গ্রাম) প্রয়োগ করতে হবে।
- ✪ ফল বৃদ্ধির সময় জিংক সালফেট ১০ গ্রাম/ লিটার পানিতে মিশিয়ে ২১ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে।
- ✪ গুটি বাধার পর পরই পানোফিক্স বা মিরাকুলান প্রতি ৪.৫ লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ✪ বোরিক এসিড বা সলুবোর বোরন ২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।



৩। আনারস চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: আনারস
ইংরেজি নাম: Pineapple
বৈজ্ঞানিক নাম: *Ananas comosus (L.) Merr.*

ভূমিকা

আনারস এক প্রকারের গুচ্ছফল। বর্তমানে ক্রান্তীয় অঞ্চলেসহ বিশ্বের সর্বত্রই এর চাষের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আনারস একটি বহুবর্ষজীবী ভেষজ, যা ১.০ থেকে ১.৫ মি. লম্বা, যদিও কখনও কখনও এটি আরও লম্বা হতে পারে। গাছের শক্ত, মোমযুক্ত পাতাসহ একটি ছোট, মজুত কাণ্ড রয়েছে। এর ফল তৈরি হওয়ার সময়, এটি সাধারণত ২০০টি পর্যন্ত ফুল উৎপাদন করে, যদিও কিছু বড় জাতের ফলে এর চেয়ে বেশিও উৎপাদিত হতে পারে। এতে একবার ফুল ফোটে। বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনারস একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। বাংলাদেশে প্রায় ১৪.৪ হাজার হেক্টর জমিতে আনারসের চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন ২ লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৫ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইল জেলায় আনারসের ব্যাপক চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতে ও আনারসের চাষাবাদ হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।

ঔষধিগুণ

আনারস দেহের গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। গয়টার অর্থাৎ থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীত হওয়া প্রতিরোধ করে। নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চ রক্তচাপ। এটি আর্থরাইটিস উপশমে সহায়তা করে। তা ছাড়া কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের জীবাণু ধ্বংসে উপকারী। পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং মর্নিং সিকনেস অর্থাৎ সকালের দুর্বলতা দূর করে। এটি জরায়ু, ফুসফুস, অন্ত্র ও ত্বকের ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার্ধক্যজনিত চোখের ত্রুটি প্রতিরোধে সাহায্য করে। আনারস জ্বর ও জন্ডিস রোগের জন্য বেশ উপকারী। এক কথায়, দেহের পুষ্টি সাধন এবং দেহকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখার জন্য এটি একটি অতুলনীয় এবং কার্যকর ফল।

পুষ্টিগুণ

আনারস পুষ্টির বেশ বড় একটি উৎস। আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ফসফরাস। এসব উপাদান আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব পূরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। প্রতি ১০০ গ্রাম -এ শক্তি ৫০ kcal, শর্করা ১৩.১২ গ্রাম, চিনি ৯.৮৫ গ্রাম, খাদ্য আঁশ ১.৪ গ্রাম, স্নেহ পদার্থ ০.১২ গ্রাম, প্রোটিন ০.৫৪ গ্রাম, থায়ামিন (বি১) ০.০৭৯ মিগ্রা., রিবোফ্লাভিন (বি২) ০.০৩২ মিগ্রা, নায়াসিন (বি৩) ০.৫ মিগ্রা., প্যানটোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) ০.২১৩ মিগ্রা., ভিটামিন বি৬ ০.১১২ মিগ্রা., ফোলেট (বি৯) ১৮ µg, কোলিন ৫.৫ মিগ্রা., ভিটামিন সি ৪৭.৮ মিগ্রা., ক্যালসিয়াম ১৩ মিগ্রা., লৌহ ০.২৯ মিগ্রা., ম্যাগনেসিয়াম ১২ মিগ্রা., ম্যাঙ্গানিজ ০.৯২৭ মিগ্রা., ফসফরাস ৮ মিগ্রা., পটাসিয়াম ১০৯ মিগ্রা., জিংক ০.১২ মিগ্রা., পানি ৮৬.০০ গ্রাম।

জাত

হানিকুইনঃ পাকা আনারসের শাঁস হলুদ বর্ণের হয়। চোখ সুচালু ও উন্নত। গড় ওজন ১ কেজি। পাতা কাঁটা বিশিষ্ট। হানিকুইন সবচেয়ে মিষ্টি আনারস। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ জাতের আনারস বেশি চাষ হয়।

জায়েন্ট কিউ (কেলেঙ্গা)ঃ বাংলাদেশে আবাদকৃত আনারসের মধ্যে জমি এবং উৎপাদনের দিক থেকে 'জায়েন্ট কিউ' জাতটির অবস্থান সবার উপরে। পাকা আনারস সবুজাভ ও শাঁস হালকা হলুদ। চোখ প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা। গড় ওজন ২ কেজি। গাছের পাতা সবুজ, প্রায় কাঁটাবিহীন। ফল খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪০ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার ও টাঙ্গাইল জেলায় এ জাতের আনারস বেশি চাষ হয়।

ঘোড়াশালঃ পাকা আনারস লালচে এবং ঘিয়ে সাদা হয়। চোখ প্রশস্ত এবং গড় ওজন ১.২৫ কেজি। পাতা কাঁটাবিশিষ্ট, চওড়া ঢেউ খেলানো থাকে। ঢাকা ও নরসিংদী জেলায় এ জাতটির চাষ সীমাবদ্ধ। সঠিক পরিচর্যার অভাব এবং অন্যান্য ফসলের চাপে এ জাতের আওতাধীন জমি দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

জলঢুপিঃ পাকা আনারস লালচে ও ঘিয়ে সাদা রঙের হয়ে থাকে এবং চোখ প্রশস্ত। গড় ওজন ১.০-১.৫ কেজি। পাতা কাঁটা বিশিষ্ট, চওড়া ও ঢেউ খেলানো থাকে। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

জন্মস্থান/উৎস

আনারস ফলের আদি জন্মস্থল দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ। তবে বর্তমানে ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিশ্বের সর্বত্রই এর চাষের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কোস্টারিকা, ব্রাজিল এবং ফিলিপাইন এই তিনটি দেশ একত্রে বিশ্বের সমগ্র আনারস উৎপদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে।

মাটি ও জমি তৈরি

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও জমি সমতল করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে।

চারা রোপণ

মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস) আনারসের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সেচের সুবিধা থাকলে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি মাস) পর্যন্ত চারা লাগানো যায়। ১ মিটার প্রশস্ত বেডে দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে।

সারি থেকে সারির দূরত্বঃ ৫০ সেমি.
চারা থেকে চারার দূরত্বঃ ৩০-৪০ সেমি.

বংশবিস্তার

আনারসের বংশবিস্তার বীজের মাধ্যমে হয় না। বিভিন্ন ধরনের চারার মাধ্যমে আনারসের বংশবিস্তার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পার্শ্ব চারা, বোঁটার চারা, মুকুট চারা ও গুড়ি চারা দিয়ে আনারসের বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে পার্শ্ব চারা সবচেয়ে ভালো । বিভিন্ন জায়গা থেকে চারা পাওয়া যায়। পাতার কক্ষ থেকে, মাটির কাছের পাতা থেকে, বোটার পাশ থেকে, মুকুট থেকে বা পুরোনো গাছের গোড়া থেকেও চারা পাওয়া যায়। তবে পাতার কক্ষ থেকে যে চারা পাওয়া যায় সেটি সব থেকে ভালো হয়ে থাকে।

সার প্রয়োগ

সারের পরিমাণঃ গাছ প্রতি সারের পরিমাণ পচা গোবর ২৯০-৩১০ গ্রাম, ইউরিয়া ৩০-৩৬ গ্রাম, টিএসপি ১০-১৫ গ্রাম, এমওপি ২৫-৩৫ গ্রাম, জিপসাম ১০-১৫ গ্রাম।

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার বেডে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ

শুকনো মৌসুমে আনারস ক্ষেতে সেচ দেওয়া দরকার। তাছাড়া বর্ষাকালে যাতে অতিরিক্ত পানি না জমে সে ব্যবস্থা করতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেমি. পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছা আনারসের খুবই ক্ষতি করে। বছরে অন্তত দুবার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে; একবার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল সংগ্রহ করার পর ও দ্বিতীয় বার অক্টোবর-নভেম্বর মাসে।

মালচিং

জমিতে মালচিং করে নিলে জমি আগাছা মুক্ত থাকে। আগাছা দিয়ে মালচিং করার পর একসময় পচে জৈব সার হিসেবে মাটিতে যুক্ত হয় এবং এতে করে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে আনারস ক্ষেতে সেচ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেমি. পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফল সংগ্রহ

সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসে আনারস পাকে।

ফলন

প্রতি হেক্টর জমিতে হানিকুইন আনারস ২৫-৩০ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

পাতার সাদা দাগ রোগঃ পাতায় হালকা বাদামি কিনারা যুক্ত ধূসর-বাদামি পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। দাগ আস্তে আস্তে বড় হয় এবং শুকিয়ে যায়। ফল ও সাকারের গোড়ায় পচন দেখা যায় ।

ব্যবস্থাপনাঃ

❖ আক্রান্ত ক্ষেতে ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে জিনেব গ্রুপের ছত্রাক নাশক যেমন: ইন্ডোফিল-জেড-৭৮ মিশিয়ে স্প্রে করা।

আনারসের হার্ট রট রোগঃ আক্রান্ত গাছ নেতিয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা শুকাতে থাকে ও কুঁচকে যায়। আক্রান্ত গাছ থেকে কুশির পাতা আস্তে টানলে খুলে আসে, পাতার গোড়া ও শিকড় পচে যায়।

ব্যবস্থাপনাঃ

❖ আক্রান্ত ক্ষেতে ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে জিনেব গ্রুপের ছত্রাক নাশক যেমন: ইন্ডোফিল-জেড ৭৮ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪। মিষ্টি তেঁতুল চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: তেঁতুল
ইংরেজি নাম: *Tamarind*
বৈজ্ঞানিক নাম: *Tamarindus indica L.*

ভূমিকা

তেঁতুল আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ফল হলেও মিষ্টি তেঁতুল ততোটাই অপরিচিত। তেঁতুলের নাম শোনা মাত্রই সবার কাছে একটি টক স্বাদের ফলের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এই তেঁতুলটি সম্পূর্ণ মিষ্টি স্বাদযুক্ত একটি ফল। ২০০৯ সালে পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি 'বারি তেঁতুল-১' নামে একটি মিষ্টি তেঁতুলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এই মিষ্টি তেঁতুলের উৎপত্তিস্থল থাইল্যান্ড। ১৯৯৯ সালে প্রথম খাগড়াছড়িতে এর গাছ লাগানো হয় এবং ২০০৭ সালে এটি প্রথম ফল দেয়। মিষ্টি তেঁতুল লিগিউমিনোসি (Leguminosae) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ।

ভেষজগুণ

ইউনানি, আয়ুর্বেদি, হোমিও এবং অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের কাঁচামাল হিসেবে তেঁতুল সমাদৃত। এর পাকা ফল হৃদরোগের জন্য উপকারী। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। তেঁতুলের সাথে রসুন মিশিয়ে খেলে রক্তের কোলস্টেরল কমে। নিয়মিত তেঁতুল খেলে প্যারালাইসিস রোগীর অনুভূতি ফিরে আসে। টারটারিক অ্যাসিড থাকায় হজমশক্তি বাড়ায়। তাই পেটফাঁপা ও কাশি দূর করতে পুরোনো তেঁতুল ঘুলে; সে সাথে পরিমাণমতো পানি, লবণ, গুড় অথবা চিনি মিশিয়ে খেতে হবে। বুক ধড়ফড়, মাথা ঘুরানো, হাত-পা জ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় ও ক্ষুধামন্দা নিরাময়ে বেশ কাজ করে। তেঁতুল অতিরিক্ত ফ্যাট বের করে প্রজননতন্ত্রের কাজ শক্তিশালী করে। ধুতরা, কচু এবং অ্যালকোহলের বিষাক্ততা নিরাময়ে তেঁতুলের শরবত বেশ কার্যকরী। গাছের পাতা ও ছাল অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল। তাই শরীরের ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি হাঁপানি, চোখ জ্বালাপোড়া এবং দাঁতব্যাথা সারিয়ে তুলে। গর্ভাবস্থায় মায়েদের বমিবমি ভাব দূর করে। কাঁচা তেঁতুল গরম করে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে প্রলেপ দিলে ব্যথা সেরে যায়। মুখে ঘা হলে পানির সাথে তেঁতুল মিশিয়ে কুলকুচা করলে আরাম পাওয়া যায়, নিরাময়েও কাজ হয়। কোনো কোনো এলাকার মানুষ তেঁতুলপাতা বেঁটে, মরিচ ও লবণ মিশিয়ে বড়া বানিয়ে পান্তা ভাতের সাথে খায়। এতে শরীরে অনেক উপকারে আসে। কচি পাতায় প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে। পাতার রস সর্দি, কাশি, প্রস্রাবের যন্ত্রণা, পাইলস, কৃমি ও চোখওঠা সারাতে সহায়তা করে। তেঁতুলের বিচিতে এক ধরনের অ্যানজাইম আছে, যা রক্তের চিনির মাত্রা কমায়। এতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া এর গুঁড়া নিয়মিত খেলে পেটের আলসার ভালো হয়। তেঁতুলের তৈরি শরবত খেতে অন্যরকম স্বাদ। অনেক রোগের মহৌষধ। শরবত বানানোর জন্য আধাকাপ পরিমাণ পানিতে কয়েক ঘণ্টা ভিজিয়ে ঘুলিয়ে নিতে হয়। এরপর ছাকুনি দিয়ে ছেঁকে, অন্য পাত্রে দেড় কাপ পানিতে পরিমাণ মতো গুড় ঘুলিয়ে, সে মিশ্রণ মেশাতে হবে। সাথে থাকবে আয়োডিনযুক্ত লবণ। পরে আরো এক কাপ স্বাভাবিক কিংবা ঠান্ডা পানি।

এভাবেই হয়ে যাবে ভেষজ শরবত। এরপর গ্লাসে ঢেলে রুচিমতো লেবুর রস দিয়ে খাওয়া যায়। তেঁতুলের পাতা দিয়ে ভেষজ কীটনাশক তৈরি করা যায়। এজন্য একটি পাত্রে এক লিটার পানির সাথে ১০-১২ গ্রাম শুকনো পাতা এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর পাত্রটি ঢাকনা দিয়ে ১ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এবার ঢাকনা সরিয়ে ২-৩ টুকরা রঙিন পলিথিন দিয়ে এমনভাবে মুখ বন্ধ করতে হবে যেন ভেতরে বাতাস ঢুকতে না পারে। এভাবে এক সপ্তাহ রেখে দিতে হয়। এবার ছাকুনির সাহায্যে ছেঁকে নিলেই হয়ে যাবে ফসলের ক্ষতিকর পোকা মারার কীটনাশক। ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি. ভেষজ কীটনাশক মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।



পুষ্টিগুণ

তেঁতুল একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টি তেঁতুলে ৭০ গ্রাম ক্যালরি, ১৪.৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৮৬৭ আই.ইউ ভিটামিন 'এ', ৪২৯ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪৪ মি. গ্রাম ভিটামিন 'সি', ২.৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৬.৩ গ্রাম আঁশ পাওয়া পায়।

জন্মস্থান/উৎস

আদি নিবাস আফ্রিকার সাভানা অঞ্চল। তবে সুদান থেকে বীজের মাধ্যমে বাংলাদেশে বংশবিস্তার হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

জাত

বারি তেঁতুল-১ঃ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। 'বারি তেঁতুল-১' জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম ঝোপালো ও ছড়ানো। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং মার্চ মাসে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (৩২ গ্রাম)। শাঁস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি (টিএসএস ৭৫%)। খাদ্যপযোগী অংশ ৫৩%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

জলবায়ু ও মাটি

মিষ্টি তেঁতুল মৃদু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। তবে সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে ভারী বৃষ্টিপাত যুক্ত স্থানেও হয়। উঁচু, উর্বর, গভীর সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মিষ্টি তেঁতুলের জন্য সর্বোচ্চ ৪৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এবং বাৎসরিক ৫০০-১৫০০ মিমি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। মিষ্টি তেঁতুল সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১,০০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত জন্মে। সাধারণত এ গাছ মৃদু অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু বেলে দোআঁশ মাটিতেও ভাল হয়।

বংশবিস্তার

বীজ এবং অঙ্গজ দুই ভাবেই মিষ্টি তেঁতুলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব।

বীজ দ্বারা বংশবিস্তারঃ পরিপক্ক বীজ বীজতলায় চারা তৈরি করে বংশবিস্তার করা যায়। এক্ষেত্রে বীজ গজানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় লাগে। মিষ্টি তেঁতুলের বীজ ভালভাবে শুকিয়ে রাখলে কয়েক মাস পর্যন্ত এর সজীবতা বজায় থাকে। কিন্তু বংশবিস্তারের জন্য সংগৃহীত বীজ একটি উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন গাছ থেকে নির্বাচিত হওয়া উচিত। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছের গুণাগুণ মাতৃগাছের মত না হওয়ায় এবং ফলন দেরিতে হওয়ায় এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই পরিহার করা হয়। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছ ৭-৮ বছরে ফল দেয়।

অঙ্গজ বংশবিস্তারঃ মিষ্টি তেঁতুলের ক্ষেত্রে অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। অঙ্গজ উপায়ে উৎপাদিত গাছে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে গুটি কলম ও গ্রাফটিং এর মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরকম গাছ থেকে ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সব পদ্ধতির ক্ষেত্রে গাছের কাণ্ডটি নির্বাচনের পূর্বে খুব ভাল করে খেয়াল করতে হবে যে, তা যেন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন থেকে মুক্ত হয়।

লেয়ারিং (Layering)ঃ বর্ষাকাল গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল গুটি কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। শাখার অগ্রভাগ থেকে ৩০-৪০ সেমি দূরে পর্বসন্ধি থেকে ১ সেমি নিচে ৩-৪ সেমি. জায়গা জুড়ে শাখার চতুর্দিকের বাকল তুলে ফেলা হয়।

তারপর ক্ষতস্থানে লালচে স্তর (ক্যাম্বিয়াম) চাকু দ্বারা ভালভাবে চেঁছে তুলে ফেলা হয়। ক্যাম্বিয়াম স্তর না তুলে ফেলা হলে এতে শিকড় গজায় না। এরপর ক্ষতস্থানের অগ্রবর্তী নিকটতম পর্বসন্ধিসহ ক্ষতস্থানটিকে শিকড় মাধ্যম (অর্ধেক মাটি, অর্ধেক গোবর ও পানির মিশ্রণে তৈরি পেস্টের মতো) দ্বারা আবৃত করে সাদা পলিথিন কাগজ দ্বারা পেঁচিয়ে চিকন সুতলি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। এ কলম করার ৪-৮ সপ্তাহের মধ্যে এতে শিকড় গজায়। শিকড় গজানোর পর গুটির ১-২ সেমি. নিচে ২-৩ ধাপে কলমটিকে কেটে মাতৃ গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিছু পাতা ফেলে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঁঝড়ি দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

গ্রাফটিংঃ গ্রাফটিং বলতে বুঝায় একটি কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি কাণ্ড বা মুকুল কেটে নিয়ে অপর একটি গাছে (রুটস্টক) প্রতিস্থাপন করা। তারপর প্রতিস্থাপিত কাণ্ডটি অথবা মুকুলটি রুটস্টকের সাথে সফলভাবে জোড়া লেগে গেলেই গ্রাফটিং সফলভাবে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। গ্রাফটিং করার সময় সাধারণত একটি অধিক কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছ থেকে কাণ্ড বা কুঁড়ি সংগ্রহ করে অপর একটি সাধারণ রুটস্টকে সংযোজন করা হয়। গ্রাফটিং ফল ধারণের সময় কমিয়ে আনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড় কলমঃ বসন্ত ও শরৎকাল এ কলম করার সবচেয়ে উপযোগী সময়। বিশেষত বসন্তের শুরুতে যখন গাছের সুপ্ততা ভেঙ্গে আসতে থাকে তখনই এ কলম করা হয়। এ কলম তৈরির জন্য সাধারণত ২.৫-১০ সেমি. ও ব্যাসের আদি জোড় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত আদি জোড়ের মসৃণ শাখাবিহীন স্থানে ধারালো ছুরি দ্বরা আনুভূমিকভাবে কেটে সেখানে লম্বাভাবে ৫-৭.৫ সেমি গভীর করে ফাটাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ফাটানো কাজটি খাড়াভাবে হয়। উপজোড় প্রস্তুতের জন্য সাধারণত ২-৩টি কুঁড়িযুক্ত ৭.৫-১০ সেমি. দীর্ঘ উপজোড় শাখা নির্বাচন হয়। নির্বাচিত উপজোড়ের নিচের প্রান্তে তির্যক কর্তনের মাধ্যমে একটি গোজের মত তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আদি জোড় অর্থাৎ ২.৫ সেমি. ব্যাসের চেয়ে বেশি ব্যসযুক্ত আদি জোড়ের জন্য একটি উপজোড় গোজের পরিবর্তে দুটি গোজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি গোজকেই ফাটলের যে কোন একপাশে বা কিনাওে স্থাপন করা হয়। যদি এ ফাটলের মধ্যে উপজোড় গোজ শক্ত বা আঁটোসাঁটো হয়ে না বসে তবে সংযোগ স্থান শক্ত কওে বেঁধে আটোঁসাঁটো করা হয় এবং সংযোগ স্থান গ্রাফটিং মোম দ্বারা এমনভাবে আবৃত করা হয় যাতে ভিতরে কোন পানি ঢুকতে না পারে। এছাড়া সমস্ত কলমটিকে একটি পলিথিন দ্বারা আবৃত রাখলেও কলমের মধ্যে সহজে পানি ঢুকতে পারে না।

চারা রোপণের সময়

চারা রোপণ জুন-নভেম্বর মাসে করতে হবে। অতঃপর চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত পানি সেচদিতে হবে। তবে আষাঢ়-ভাদ্র (মধ্য জুন-মধ্য সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

জমি প্রস্তুত ও গর্ত তৈরি

গর্ত তৈরির পূর্বে জায়গাটির আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা অপসারণ করতেহবে। তারপর কোদালের সাহায্যে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হতে হবে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার।

গর্তে সার প্রয়োগ

প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ হল পচা গোবর ২০-২৫ কেজি টিএসপি ৪০০-৫০০ গ্রাম এমপি ৫০০-৬০০ গ্রাম জিপসাম ২০০-৩০০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ৪০-৬০ গ্রাম। উল্লিখিত সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।



চারা রোপণের দূরত্বঃ সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০ মিটার।

চারা রোপণঃ সুস্থ সতেজ এক বছর বয়সী চারা গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়াটি মাটির বল ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং চারায় বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: চারা অবস্থায় গাছের চারদিকের আগাছা অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত। অন্তত চার বছর পর্যন্ত আগাছা ব্যবস্থাপনা করা উচিত যাতে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত না হয়। বাণিজ্যিকভাবে যে সব বাগান করা হয় বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যদি আন্তঃফসল হিসেবে কোন গাছ না থাকে তাহলে আগাছা দমন অত্যন্ত জরুরি। এতে বাগানের মাটিতে সঠিক পরিমাণে আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব।

আন্তঃফসল

গাছ লাগানোর প্রথম চার বছর পর্যন্ত বাগানে আন্তঃফসল করা যায়। এ ক্ষেত্রে আন্তঃফসল হিসেবে সাধারণত বাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মুগডাল, ফেলন, স্বল্পমেয়াদী দানা জাতীয় শস্য, আদা ও হলুদ চাষ করা যেতে পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

মিষ্টি তেঁতুল একটি খরা সহনশীল গাছ। প্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রতিষ্ঠিত তেঁতুল গাছে পানি প্রয়োগের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চারা অবস্থায় মাটির আর্দ্রতার বিশেষ প্রয়োজন হয় বলে ভালভাবে চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নার্সারিতে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর পানি দিতে হয়। পানি সব সময় বিকেলে দিতে হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পানি সেচ দিলে গাছের গোড়ায় পানি আটকে চারা মারাও যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা করতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করা যায়।

ছাঁটাইকরণ

চারা গাছের ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর থেকে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে না পারে।

ফুল আসার সময় ঃ এপ্রিলের শেষের দিকে সাধারণত মিষ্টি তেঁতুল গাছে ফুল আসে।

ফল সংগ্রহ

মিষ্টি তেঁতুলের ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় বসন্তের শেষ দিকে এবং গ্রীষ্মের শুরতে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)।

ফলের পরিপক্কতা ও ফলন

মিষ্টি তেঁতুলের সব ফল (পড) একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই হারভেস্টও করতে হয় আলাদা আলাদা সময়ে। সাধারণত গাছ থেকে ফল পাড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি পডের বাইরের রং যেন বাদামী বর্ণের হয়। সুষ্ঠুভাবে পরিপক্ক ফলের ভিতরের পাল্প আঠালো ও বাদামী বা গাঢ় বাদামী রঙের হয় এবং বীজগুলো শক্ত ও চকচকে হয়। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুলের পডের বহিঃত্বক খুব সহজেই হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ভাঙ্গ যায় এবং চাচ দিলে একটি মচমচে শব্দ হয়। আর পডের ভিতরের পাল্প শুকিয়ে সামান্য কুঁচকে যায়।

ফল সংগ্রহের উপায়/কৌশল

গাছ থেকে পাকা অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুল সংগ্রহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো মই দিয়ে গাছে উঠে একটি একটি করে পাড়া যাতে এর বাইরের ত্বক ভেঙ্গে না যায়। কারণ মিষ্টি তেঁতুলের শেলফ লাইফ মোটামুটিভাবে পুরোটাই নির্ভর করে এর বহিঃত্বক বা খোসার ওপর। কারণ বহিঃত্বক ভেঙ্গে গেলে পড খুব তাড়াতাড়ি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য পাওয়া যায় না।

পোকার আক্রমণ

মিষ্টি তেঁতুল গাছে রোগ ও পোকামাকড়ের তেমন উপদ্রব লক্ষ্য করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনঃ

- ❖ ফল সংগ্রহ করার পর পর মৃত, অর্ধমৃত, শুকনা ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।
- ❖ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে।

ফল ধরার পর আক্রমণ শুরু হলে আক্রমণ শুরতেই প্রতি লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধা ভাঙ্গা নিমের বীজ সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকাল বেলা পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে। তারপরও আক্রমণ দেখা গেলে সুমিথিয়ন ৫০ইসি ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

৫। সফেদা ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: সফেদা
ইংরেজি নাম: *Sapodilla*
বৈজ্ঞানিক নাম: *Manilkara zapota*

ভূমিকা

সফেদা গাছ বহুবর্ষজীবী, চিরসবুজ বৃক্ষ। সফেদা গাছ উষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চল ছাড়া বাঁচে না। শীতল আবহাওয়ায় সহজেই মরে যায়। এই গাছ ঝড়-বাতাসে টিকে থাকতে পারে। এর ছালে প্রচুর সাদা আঠালো কষ থাকে, যা 'চিকল' নামে পরিচিত। দুধের ন্যায় কষগুলো বেশ আঠালো বিধায় তা একসময় চুইং গাম শিল্পখাতে অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতো। আজটেক সভ্যতায় প্রস্তুতকৃত চুইং গামের কাঁচামাল ছিল এর কষ। সফেদা গাছে ফল আসতে ৫-৮ বছর লাগে। এতে বছরে দুইবার ফল আসতে পারে যদিও গাছে সারা বছর কিছু কিছু ফুল থাকে। সফেদা বাংলাদেশের একটি সুস্বাদু সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশে সর্বত্রই এ ফল জন্মায় তবে বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সফেদার চাষ বেশি হয়। সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অতি সহজেই এদেশে সফেদার ব্যাপক চাষ করা সম্ভব।

ঔষধিগুণ

সফেদা একটি ফাইবার সমৃদ্ধ ফল, তাই একে প্রাকৃতিক জোলাপ হিসেবে ব্যাবহার করা যায়। এতে পর্যাপ্ত খাদ্য আঁশ রয়েছে যা হজম বদহজম এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। আধাপাকা সফেদা জলে ফুটিয়ে কষ বের করে খেলে ডায়রিয়া ভালো হয়। এতে প্রদাহ বিরোধী উপাদান রয়েছে যা ক্ষয়কারক গ্যাস্ট্রিক, আন্ত্রিক প্রদাহ, পেট জ্বালা, ইত্যাদি রোগের সমাধান করে। সফেদা খেলে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ দূর হয়। এছাড়াও সফেদায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ এবং সি রয়েছে। নিয়মিত সফেদা খেলে মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায় ও দাঁত ভালো থাকে। শরীরের কোষের ক্ষতিসাধন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। নিয়মিত সফেদা খেলে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগার সমস্যা কমে যায়। শ্বাসকষ্ট দূর করতে সাহায্য করে এবং ফুসফুস ভালো রাখে। ত্বকে বয়সের ছাপ দূর করতে সফেদা সহায়তা করে। এতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ আছে। এটি চোখ, ত্বক ও হাড়ের জন্য খুব ভালো। শরীরের ওজন কমাতে চাইলে নিয়মিত সফেদা খেতে পারেন। সফেদায় চর্বি থাকে না। তাই বেশি খেলেও শরীরে মেদ বাড়ার আশঙ্কা থাকে না। সফেদার পুষ্টি এবং কার্বোহাইড্রেট থেকে কর্মজীবী মায়ের জন্য অনেক উপকারী। এটা গর্ভাবস্থায় বমি বমি ভাব এবং মাথা ঘোরা দূর করতে সাহায্য করে। সফেদায় থাকা ডায়াটরি ফাইবার, পলিফেনলিক যৌগ ও ভিটামিন আমাদের শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত সফেদা খেলে শারীরবৃত্তীয় কাজের গতি ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে থাকা ক্যালসিয়াম, আয়রন ও ফসফরাস হাড়ের গঠনকেও মজবুত করে। হঠাৎ করে সর্দি, কাশি হলে ওষুধের বিকল্প হিসেবে সফেদা খেতে পারবেন। সফেদায় আছে প্রচুর পরিমাণ গ্লুকোজ। এই গ্লুকোজ শক্তি দেয়। কাজেও আসে গতি। সফেদা ফলে অসাধারণ এক ক্ষমতা আছে। তাই খেতে পারেন। সফেদা একদিকে ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করে কোষের ক্ষয় পূরণ করে, অন্যদিকে নতুন কোষ তৈরিতে অংশ নেয়। ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তেও বাধা দেয়। সফেদা বীজের চুর্ণ খেলে কিডনির রোগ ভালো হয় এবং এটা মূত্রাশয়ের পাথর অপসারণ করতে সাহায্য করে।

পুষ্টিগুণ

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' এর একটি ভাল উৎস হচ্ছে সফেদা। প্রতি ১০০ গ্রাম পুষ্টির মান শক্তি ৮৩ কিলো ক্যালরী, কার্বোহাইড্রেট ১৯.৯৬ গ্রাম, ফাইবার ৫.৩ গ্রাম, ফ্যাট ১.১ গ্রাম, প্রোটিন ০.৪৪ গ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.০২ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.২ মিলিগ্রাম, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ০.২৫২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি৬ ০.০৩৭ মিলিগ্রাম, ফোলেট ১৪ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি ১৪.৭ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ২১ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৮ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১২ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ১৯৩ মিলিগ্রাম, দস্তা ০.১ মিলিগ্রাম।

জন্মস্থান/উৎস

সফেদার আদি নিবাস মেক্সিকোর দক্ষিণাংশ, মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চল। পেটেনেস ম্যানগ্রোভ ইকোঞ্চলের উপকূলীয় ইউকাতানে এই গাছ প্রাকৃতিকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। স্প্যানিশ উপনিবেশ আমলে এটি ফিলিপাইনে নেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মেক্সিকোতে এর ব্যাপক উৎপাদন হয়।

জাত

'বারি সফেদা-১': 'বারি সফেদা-১' উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। ফল দেখতে গোলাকার চ্যাপ্টা। আকারে বেশ বড়। প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। গাছ প্রতি বাৎসরিক ফলন ১১০-১২০ কেজি। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন। কম বেশি সারা বছরই ফল ধরে। প্রধানত চট্টগ্রাম এলাকায় জাতটি ভাল জন্মে। তবে অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ করা যায়।

'বারি সফেদা-২': 'বারি সফেদা-২' উচ্চ ফলনশীল জাতটি বাংলাদেশের মধ্য-অঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও নরসিংদী এলাকায় চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। দেশের মধ্য অঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ করা যেতে পারে। সফেদার এ জাতটিতে নিয়মিত পৌষ থেকে বৈশাখ মাস (মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত সর্বাধিক ফল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরের অন্য সময়েও কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়।

'বারি সফেদা-৩': ফল প্রদর্শনীর মাধ্যমে শনাক্তকৃত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে২০০৯ সালে 'বারি সফেদা-৩' নামে সফেদার নিয়মিত ফলধারী উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও অধিক শাখা প্রশাখাসমৃদ্ধ। গাছ প্রতি গড়ে ১৮০০টি ফল ধরে যার ওজন ২০০-২২৫ কেজি। হেক্টর প্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। জাতটি বছরে দুই বার ফল দেয় যা কার্তিক ও মাঘ মাসে আহরণোপযোগী হয়। সারাদেশে চাষোপযোগী জাতটি অমৌসুমে দেশি ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

জমি নির্বাচন

উঁচু নিকাশযুক্ত বেলে ও দোআঁশ মাটি সফেদা চাষের জন্য বেশি উপযোগী। তবে অন্যান্য উঁচু জমিতেও চাষ করা যায়।

কলম উৎপাদন

গ্রাফটিং এর মাধ্যমে সফেদার কলম তৈরি করে নিতে হবে। 'খিরণী' গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারাকে সফেদার 'রুটস্টক' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রোপণ দূরত্বঃ সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬ মিটার হিসেবে রোপণের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

কলম রোপণ

হেক্টর প্রতি চারা লাগবে ২৭৮টি। চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে নিয়ম অনুযায়ী গর্ত তৈরি করে নির্ধারিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ

প্রতিগর্তে সারের নাম সারের পরিমাণ টিএসপি ২৫০-৩০০ গ্রাম, এমওপি ২৪০-২৫০ গ্রাম, গোবর ১০-১৫ কেজি। কলম লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে গর্তে সার ও মাটি মিশিয়ে রাখতে হবে। লাগানোর পরে চারায় প্রথম ২-৩ দিন প্রয়োজনমতো পানি দিতে হবে এবং খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা লাগানোর পর সার প্রয়োগঃ

গাছের বয়স অনুসারে সারের পরিমাণ নির্ভর করে।

সারের নাম	গাছের বয়স				
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১১-১৫ বছ	১৫ বছর এর উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট (কেজি)	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১০০-২০০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৫০০	৭০০	৮০০
এম ও পি (গ্রাম)	১৫০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০	১০০	২০০	৩০০	৪০০

প্রয়োগ পদ্ধতিঃ উল্লিখিত পরিমাণ সার সমান তিন কিস্তিতে যথাক্রমে মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে প্রয়োগকরতে হবে। গোবর বা কম্পোস্ট সার মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দুই কিস্তিতে দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ

সফেদা গাছ খরা সহ্য করতে পারে। তবে বেশি খরার সময় প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ফলন ভাল হয়।

ফসল তোলা

ফল বৃদ্ধি হওয়ার পর শক্ত অবস্থায় ফল সংগ্রহ করতে হয়।



৬। শরীফা ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: শরিফা
ইংরেজি নাম: Custard-apple, Sugar-apple, Sugar-pineapple
বৈজ্ঞানিকনাম: *Annona squamosa*

ভূমিকা

শরিফা বাংলাদেশের একটি সুপরিচিতি ফল। আতা ফলের সাথে এ ফলের অনেক মিল রয়েছে, তবে শরিফা ফলের উপরিভাগ গোলাকার উত্থিত খন্ডে বিভক্ত। এছাড়া উদ্ভিদতাত্ত্বিক দিক দিয়েও এদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আমেরিকান নিরক্ষীয় অঞ্চল এর উৎপত্তি স্থান। শরিফা ফল আতা ফলের তুলনায় মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত এবং আকারে ছোট।

ঔষধিগুণ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। শরিফা ফলে থাকা উচ্চমাত্রার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। দুরারোগ্য ব্যাধিকে দূর করে শরীরকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে।শরিফা ফলের ম্যাগনেসিয়াম মাংসপেশির জড়তা দূর করে এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এর পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি৬ রক্তের উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। শরিফা ফলে রয়েছে খাদ্যআঁশ যা হজমশক্তি বৃদ্ধি করে ও পেটের সমস্যা দূর করে। শরিফা ফলে রিবোফ্লাভিন ও ভিটামিন সি আছে। আর এই ভিটামিন উপস্থিতির কারণে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। যাদের চোখের সমস্যা তারা শরিফা ফল খেলে চোখের ভাল উপকার পাবেন। শরিফা ফলে রয়েছে প্রচুর ক্যালসিয়াম। শরীরের হাড় গঠন ও মজবুত রাখার জন্য এ ফল কার্যকর। শরিফা গাছের মূলের ছালের রস ২০/২৫ ফোঁটা ৭/৮ চা চামচ দুধ সহ খেলে আমাশয় ভাল হয়। উকুন দূর করতে: মাথায় উকুন দূর করতে শরিফা গাছের পাতার রস ২ চা চামচ তার সঙ্গে ২/১ চা চামচ পানি মিশিয়ে চুলে লাগিয়ে কিছুক্ষণ রাখলে উকুন মরে যাবে। একদিনে ফল না পেলে ২/৩ দিন পর আবার লাগাতে হবে।

পুষ্টিগুণ

এ ফলে প্রাণীদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবগুলো পুষ্টি উপাদানই বিদ্যমান রয়েছে। খাবার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম শরিফা ফলে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ দেখানো হলো: আমিষ ১.৮ গ্রাম, শর্করা ২০.৬ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, খনিজ লবন ০.৯ গ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.০৭ মি. গ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.১৪ মি. গ্রাম, ভিটামিন - সি ৩৮.০ মি. গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৭.০ মি. গ্রাম, লৌহ ১.৫ মি. গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯০.০ কি.ক্যালোরী।

জাত

শরিফা ফল এনোনা (Annona) অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ৭ (সাতটি) প্রজাতি রয়েছে এবং একটি শংঙ্কর জাত রয়েছে। আনোনা স্কোয়ামোসা (Annona squamosa) এর চামড়ায় গুটি গুটি চোখ আছে। এটিই বাংলাদেশে বেশি জন্মে। স্বাদেও এটি সেরা, সুমিষ্ট এই ফলটি আতা নামে বেশিরভাগ স্থানে পরিচিত। তবে কেথাও একে মেওয়া কোথাও একে শরিফা বলা হয়। হিন্দিতেও একে শরিফা বলে।

জন্মস্থান/উৎস

শরিফা ফলের আদি নিবাস পূর্ব আমেরিকা। বহু বছর আগে এ ফলটি পূর্ব আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আসে। এখন পুরো উপমহাদেশে এই ফল দেখা যায়। শরিফা আতাফল এবং নোনা নামেও পরিচিত। তবে অঞ্চলভেদে কিছু পার্থক্য রয়েছে। শরিফা ফলের রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রজাতি ও প্রকরণ।

মাটি

শরিফা ফল চাষ পদ্ধতির প্রধান করণীয় হলো আপনাকে উঁচু জমি র্নিবাচন করতে হবে যে জমিতে পানি উঠেনা এমন জমি। বসতবাড়ির খোলা RvqMvgvi এবং অল্প ছায়াযুক্ত স্থানেও শরিফা চাষ করা যায়। বেলে দোআঁশ মাটিতে ও সবসময় রোদ থাকে সে স্থানে সবথেকে ভাল ফলন পাওয়া যায়। শুস্ক ও গরম পরিবেশে শরিফা গাছ ভাল হয়।

বংশবিস্তার

বর্তমানে কলমের মাধ্যমেও চারা তৈরি করা হচ্ছে। কলমের গাছে ছয়মাস থেকে এক বছর বয়সে ফল আসা শুরু করলেও বীজের চারা থেকে ফলন পেতে দুই-তিন বছর সময় লাগে। ইদানিং গ্রাফটিং করেও চারা তৈরী করা হচ্ছে। গ্রাফটিং এর জন্য ৬ থেকে ১২ মাস বয়সী চারার উপর ভিনিয়ার এবং ক্লেফট গ্রাফটিং করা হয়। গ্রাফটিং এর জন্য উপযুক্ত সময় হলো ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত।

চারা নির্বাচন

সাধারণত বীজ থেকে শরিফার চারা তৈরি করা হয়ে থাকে, তবে পুষ্ট ও নিরোগ বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হয়। এতে গাছ পুষ্ট হয় এবং ফলন ভালো হয়। বীজের আবরণ বেশ শক্ত, বীজ থেকে চারা অঙ্কুরিত হতে দুই-তিন মাস সময় লাগে। তাই বীজ পানিতে ভিজিয়ে বপণ করলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। বীজতলায় এবং পলিথিনের ব্যাগে চারা উৎপাদন করা যায়। চারার বয়স যখন ৪ থেকে ৫ মাস বয়সী হয় তখন সুস্থ্য সবল চারা বা কলম মুল জমিতে লাগাতে হয়।

চারা রোপণ

শরিফার চারা গাছ থেকে গাছের এবং সারি থেকে সারির দুরত্ব হবে ৪ মিটার অথবা ৮ হাত। জুন-জুলাই চারা রোপনের জন্য উত্তম সময়।

গর্তের পরিমাপ: ৬০ সেমি. × ৬০ সেমি. × ৬০ সেমি. গর্ত করতে হবে।
গর্তে সার প্রয়োগ: প্রতি গর্তে ২০ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম এমপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১৫ থেকে ২০ দিন রেখে দিতে হবে। এরপর গর্তের মাঝখানে খাড়াভাবে চারা রোপন করতে হবে। ১ থেকে ২ বছর বয়সী গাছে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী ও অক্টোবর মাসে দুই কিস্তিতে মোট ১৫ থেকে ২০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। একটি ফলন্ত গাছে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি, মে, এবং অক্টোবর মাসে ১৫০ থেকে ১৭৫ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ থেকে ১৭৫ গ্রাম টিএসপি, ১৫০ থেকে ১৭৫ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

সেচপদ্ধতি

সার দেওয়ার পরপর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটি শুকিয়ে গেলে সেঁচ দিতে হবে।

গাছের পরিচর্যা

পরিচর্যার অংশ হিসেবে ডালপালা ছেটে দেয়া।

ফল/ফসলসংগ্রহ

ফুল ফোটার ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ফল পুষ্ট হয়। ফল পুষ্ট হলে হালকা সবুজ থেকে হলুদ ভাব হয়ে থাকে। সংগ্রহ করা পরিপক্ক ফল গুলো ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে পাকতে শুরু করে। শরিফা ফল পাকতে শুরু করলে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। ৩ থেকে ৪ বছর বয়সী গাছে ১৫০ থেকে ২৫০ টি পযন্ত ফল ধরে। এক একটি ফলের ওজন ১৫০ থেকে ২৫০ গ্রাম পর্যন্ত হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

শরিফা ফল গাছে পোকামাকড়ের আক্রমন তেমন দেখা না গেলেও মিলিবাগ নামের এক ধরনের পোকা ফলের উপর আক্রমন করে। বাজারে নানান ধরনের কীটনাশক পাওয়া যায়, কীটনাশক ব্যবহার করে ও হাত দিয়ে ফল পরিস্কার করে রক্ষা পাওয়া যায়।

এনথ্রাকনোজ রোগঃ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে ফল পুরোটা কালো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত ফল গাছ থেকে পাড়তে হবে এবং গাছের যে সকল ডাল মরে গেছে সে সকল ডাল কেটে ফেলেতে হবে।

শরিফার আগা মরা রোগঃ এ রোগ দেখা দিলে পুরো গাছ বা গাছের ডাল আগা থেকে শুরু করে ক্রমশ নিচের দিকে মরে যেতে দেখা যায়। এ রোগটি ছত্রাকের আক্রমনে হয়।

ব্যবস্থাপনাঃ

- আক্রান্ত গাছে সুষম মাত্রায় জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা এবং নিয়মিত সেচ প্রদান করা।
- সময়মত প্রুনিং করে, আক্রান্ত অংশ অপসারণ করে গাছ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
- কিছুটা সুস্থ্য অংশসহ আক্রান্ত অংশ কেটে পুরে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বোর্দো মিশ্রণ বা কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাক নাশক যেমন- কুপ্রাভিট ৭ গ্রাম/লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।
- নতুন পাতা বের হলে ব্যাভিস্টিন ১ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করা।

শরিফার পাতাপোড়া রোগঃ আক্রান্ত পাতায় গায়ে হলদে থেকে বাদামী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগ হয়ে পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা পুড়ে যাওয়ার মত হয়।

ব্যবস্থাপনা ঃ

- আক্রান্ত গাছের অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা।
- টিল্ট ১ মিলি/প্রতি লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করা।



৭। খেজুর ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নামঃ খেজুর
ইংরেজি নামঃ Date palm
বৈজ্ঞানিক নামঃ *Phoenix dactylifera L.*

ভূমিকা

খেজুর সুস্বাদু আর বেশ পরিচিত একটি ফল, যা ফ্রুকটোজ ও গ্লাইসেমিক সমৃদ্ধ। খেজুর এক ধরনের তালজাতীয় শাখাবিহীন বৃক্ষ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সুমিষ্ট ফল হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় অনেক বছর পূর্ব থেকেই এর চাষাবাদ হয়ে আসছে। এ গাছটি প্রধানত মরু এলাকায় ভাল জন্মে। মাঝারি আকারের গাছ হিসেবে খেজুর গাছের উচ্চতা গড়পড়তা ১৫ মিটার থেকে ২৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর লম্বা পাতা রয়েছে যা পাখির পালকের আকৃতিবিশিষ্ট। দৈর্ঘ্যে পাতাগুলো ৩ থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত হয়। পাতায় দৃশ্যমান পত্রদন্ড রয়েছে।

ঔষধিগুণ

খেজুর একজন সুস্থ মানুষের শরীরে আয়রনের চাহিদার প্রায় ১১ ভাগই পূরণ করে। তাই প্রতিদিন খেতে পারেন খেজুর। পুষ্টিবিদদের মতে, শরীরের প্রয়োজনীয় আয়রনের অনেকটাই খেজুর থেকে আসে। এ ছাড়া ডায়াবেটিস থাকলে প্রচলিত খেজুরের বদলে শুকনো খেজুরকে ডায়েটে রাখতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। অন্তত দুটি খেজুর যদি প্রতিদিন খান তবে অনেক রোগ কাছেও ঘেঁষবে না। খেজুরে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম। খেজুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। ফাইবারও মিলবে খেজুরে। প্রতিটি খেজুরে রয়েছে ২০ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, যা উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। রক্তস্বল্পতায় ভোগা রোগীরা প্রতিদিন খেজুর খেতে পারেন। যারা চিনি খান না তারা খেজুর খেতে পারেন। চিনির বিকল্প খেজুরের রস ও গুড়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় রাতে পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রাখুন। পর দিন সকালে খেজুর ভেজানো পানি পান করুন। দূর হবে কোষ্ঠকাঠিন্য। খেজুরে থাকা নানা খনিজ ür¯ú›`‡bi হার ঠিক রাখতে সাহায্য করে। খেজুরে লিউটেন ও জিক্সাথিন থাকায় তা রেটিনা ভালো রাখে।

পুষ্টিগুণ

পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুরে রয়েছে ভিটামিন, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও জিঙ্ক। এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়। খেজুর ফলকে চিনির বিকল্প হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। খেজুরের পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে বলা হয় চারটি বা ৩০ গ্রাম পরিমাণ খেজুরে আছে ৯০ ক্যালোরি, এক গ্রাম প্রোটিন, ১৩ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ২.৮ গ্রাম ফাইবার এবং আরও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান। খেজুর শক্তির একটি ভালো উৎস। তাই খেজুর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের ক্লান্তিভাব দূর হয়। আছে প্রচুর ভিটামিন বি, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। প্রতি ১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে শক্তি ২৮০ kcal, কার্বোহাইড্রেট ৭৫ গ্রাম, চিনি ৬৩ গ্রাম, ফাইবার ৮ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, প্রোটিন ২.৪ গ্রাম, ভিটামিন এ ১০ আইইউ, থায়ামিন ০.০৫২ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.০৬৬ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ১.২৭৪ মিলিগ্রাম, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ০.৫৮৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-৬ ০.১৬৫ মিলিগ্রাম, ফোলেট ১৯ গ্রাম, ভিটামিন সি ০.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ই ০.০৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে ২.৭ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৯ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.০২ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৪৩ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ ০.২৬২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৬২ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৬৫৬ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ২ মি.গ্রা, দস্তা ০.২৯ মিলিগ্রাম, জল ২০.৫ গ্রাম

জাত

পৃথিবীতে প্রায় এক হাজারের বেশি খেজুরের জাত রয়েছে। সৌদি দেশগুলোতেই এ জাতের সংখ্যা চার শতাধিক। যেহেতু তাল ও লটকন গাছের মতো খেজুরের পুরুষ-স্ত্রী গাছ আলাদাভাবে জন্মায়, এজন্য বীজ থেকে তৈরি গাছে প্রাকৃতিকভাবে নতুন জাতের সৃষ্টি হয়। তবে বীজ থেকে তৈরি চারায় প্রকৃত জাতের গুণাগুণ থাকে না। ফল ধরতে বেশি সময় লাগে, ফলের পরিমাণ ও মান আশাপদ হয় না। যেসব জাতের খেজুরের জনপ্রিয়তা বেশি এগুলোর মধ্যে বারহি, মেডজল, সামরান, খাতরাই, জাহেদি, খালাস, মরিয়ম, নিমেশি, আনবারাহ, জাম্বেলি, শিশি, লুলু, সুলতানা, আজুয়া, ইয়াবনি, ডিগলিটনূর, আসমাউল হাসনা অন্যতম।

জন্মস্থান/উৎস

সুদীর্ঘকাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানত মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার কিয়দাংশে জনসাধারণের কাছে খেজুর প্রধান উপাদেয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে, খেজুরের চাষাবাদ কিংবা খেজুর গাছের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি। ধারণা করা হয় যে, পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোয় সর্বপ্রথম এর চাষাবাদ হয়েছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীনকাল থেকেই মেসোপটেমিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক মিশরের অধিবাসীরা খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর থেকে এ গাছের গুণাগুন সম্পর্কে অবগত ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা এর ফল থেকে মদজাতীয় পানীয় প্রস্তুত করে ফসলের সময় তা পান করতো। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০ বছর আগেকার সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দেখা যায় যে, পূর্বাঞ্চলীয় আরবেও এর চাষাবাদ হতো। দক্ষিণ এশিয়ার সভ্যতা হিসেবে বিবেচিত হরপ্পা এলাকার কথা উল্লেখ আছে খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ বছর পর্যন্ত।

আবহাওয়া ও মাটি

পর্যাপ্ত রোদ, কম আর্দ্রতা, শুকনা ও কম বৃষ্টিপাত, উষ্ণ আবহাওয়া এ ফল চাষের জন্য উপযোগী। বেশি শীত এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ত সহিষ্ণু গুণাগুণ এ গাছের আছে। ফুল ফোটা ও ফল ধরার সময় বেশি বৃষ্টিপাত ভালো না। একই কারণে এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এবং পার্বত্য জেলাগুলোতে খেজুর চাষ সম্প্রসারণ করার সুযোগ আছে। বেলে-দো আঁশ মাটি এ জাতের খেজুর চাষের জন্য বেশি উপযোগী। পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত উচ্চ জমি এ ফল চাষের জন্য উপযোগী।

বংশবিস্তার

আরব দেশগুলো আগে পছন্দমতো জাতের কান্ড থেকে গজানো সাকার বা চারা সংগ্রহ করে তা দিয়ে বাগান সৃষ্টি করতেন। এছাড়া বীজের চারা দিয়েও খেজুর বাগান সৃষ্টি করার প্রচলন ছিল। তবে অধুনা টিস্যুকালচার পদ্ধতি অবলম্বনে উন্নত জাতগুলোর প্রচুর কলম তৈরি করে তা ব্যবহার জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। পুরনো পদ্ধতিতে কান্ড থেকে চারা কম পাওয়া যেত। বীজ থেকে তৈরি চারার গাছে ফল দিতে প্রায় ৬ বছর সময় লাগে। খেজুর গাছের কান্ড থেকে প্রাপ্ত চারা এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে তৈরি চারা রোপণের ৩ বছর পর থেকেই গাছে ফুলফল ধরা শুরু হয়। এখন টিস্যুকালচারের মাধ্যমে খেজুর চারা উৎপাদন কাজে কিছু প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত থাকার কারণে উন্নত জাতের বাগান সৃষ্টি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যান্য দেশগুলোও এর সুফল ভোগ করছে। এ দেশে ১৫-২০ বছর ধরে অনেকেই সীমিত আকারে খেজুর চাষ করছে তা বীজের তৈরি চারা দিয়ে, এতে ভালো জাতের প্রকৃত গুণাগুণ বজায় থাকে না, ফলের মান ও ফলন ভালো হয় না।

জমি নির্বাচন

পানি নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত অপেক্ষাকৃত উঁচু প্রচুর আলো-বাতাস পায় এমন জমি খেজুর বাগানের জন্য নির্বাচন করা দরকার।
সারি থেকে সারির দুরত্বঃ ২০ ফুট
চারা থেকে চারার দুরত্বঃ ২০ ফুট

গর্ত তৈরি ও ভরাটকরণ

রোপিত গাছের শিকড় যেন ঠিকমতো ছড়াতে পারে এজন্য ৬ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর করে গর্ত তৈরি করে নিয়ে তা এক সপ্তাহ রোদে রেখে গর্তে সার ও মাটি দিয়ে পুনরায় ভরাট করে নেয়া প্রয়োজন। তৈরিকৃত গর্তে খড়কুটা দিয়ে ভরাট করে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে গর্তের মাটি শোধন করা যাবে। খেজুর চারা রোপণের আগে যেসব সার ও উপাদান মিশানো প্রয়োজন তা হলো মোটাবালু (সিলেট স্যান্ড) ৩০%, পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার ৪০% এবং ভিটে মাটি বা বেলে দো-আঁশ মাটি ৩০%। এছাড়াও এতে আরও মেশাতে হবে ১০-১৫ কেজি কোকোডাস্ট বা নারিকেলের ছোবড়ার গুঁড়া, সমপরিমাণ কেঁচো সার। হাড়ের গুঁড়া ১ কেজি, ইউরিয়া-৩০০ গ্রাম, টিএসপি-৪০০ গ্রাম, এমওপি-৫০০ গ্রাম। এছাড়া জিংক ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ফেরাস সালফেটে ও বোরন- প্রতি গাছে ১০০ গ্রাম করে মোট ৪০০ গ্রাম মেশানো প্রয়োজন। রোগবালাই প্রতিহত করার জন্য উপযোগী ছত্রাক নাশক ও দানাদার কীটনাশক ১০০ গ্রাম করে মোট ২০০ গ্রাম মেশাতে হবে। এসব একত্রে মিশেয়ে গর্ত ভরে পানি দিয়ে কয়েক দিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। এভাবে গর্ত ভরাট করার দুই সপ্তাহ পর তা গাছ রোপণের জন্য উপযোগী হবে।

চারা রোপণ

খেজুরের চারা সমতল থেকে এক ফুট ওপরে রোপণ করতে হবে। এজন্য গর্ত ভরাট করা মাটি উঠিয়ে মধ্যভাগ উঁচু করে নিতে হবে। এরপর ক্রমান্বয়ে তা বাইরের দিক ঢালু করে নালা বরাবর মিলাতে হবে। গাছ রোপণ করা হলে গাছের গোড়া থেকে ২.৫ ফুট দূরে বৃত্তাকার করে ১০-১২ ইঞ্চি চওড়া ও ১২ ইঞ্চি গভীর নালা তৈরি করে এ নালার মাটি বাইরের দিক সুন্দরভাবে বৃত্তাকারে উঁচু আইল বেঁধে দিতে হবে। গাছ রোপণ শেষে নালায় ৮-১০ দিনের ব্যবধানে পানি দিয়ে নালা ভর্তি করে দিতে হবে। গাছ এ নালার পানি শুষে নেবে।

সেচ ও নিকাশ

বর্ষাকালে যেন বাগানে কোনো মতেই পানি না জমে এজন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হবে। খরা মৌসুমে নিয়মিত গাছের গোড়ায় সেচ দিয়ে ভেজাতে হবে। মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে ৭-১৫ দিনের ব্যবধানে নালা ভর্তি করে পানি সেচ দিয়ে গাছের রসের অভাব দূর করতে হবে। ভালোভাবে গাছের বৃদ্ধি, বেশি উন্নত মানের ফল প্রাপ্তি, প্রয়োজনীয় পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। বয়স্ক খেজুর গাছের শিকড় গোড়া থেকে প্রায় ৪-৫ ফুট বৃত্তাকারে চারদিকে ৩-৪ ফুট গভীরতায় প্রবেশ করে। এজন্য শুকনা মৌসুমে এ শিকড় ছড়ানো এলাকায় রসের অভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

মালচিং ও ট্রেনিং-প্রুনিং

শুকনা মৌসুমে গাছের গোড়ার চারধারে ২-৩ ফুট দূর পর্যন্ত বৃত্তাকারে খড়, লতাপাতা বা কচুরিপানা দিয়ে মালচিং দিতে হবে। তাতে মাটির রস সংরক্ষিত থাকে এতে ঘন ঘন সেচ দেয়ার প্রয়োজন হবে না। মালচিং দেয়ার ফলে গাছের গোড়ার চারদিক আগাছামুক্ত থাকবে, পরিবেশ অনুকূল হবে, পরে এসব লতা-পাতা পচে জৈবসার হিসেবে কাজ করবে। গাছ বড় হলে উপরি ঊর্ধ্বমুখী গাছের পাতা রেখে নিচে ঝুলে পড়া পুরনো মরা পাতাগুলো গোড়া থেকে ৭-৮ ইঞ্চি ছেড়ে ছেঁটে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও উপরের দিকের অফলন্ত ফলের ছড়া ও ফুল ফলের শক্ত ঢাকনা সাবধানে অপসারণ করতে হবে। সাথে সাথে কাটা অংশে ছত্রাকনাশক বা বোর্দ মিক্সার পেস্ট দিয়ে প্রলেপ দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিচর্যা

গাছ রোপণ করে তা কাঠি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে সম্ভাব্য সোজা রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রথম কয়েক বছর পাতা শুকালে তা কেটে দিতে হবে। কোন মতেই গাছের কাঁচা পাতা কাটা যাবে না। তবে বছরে একবার ফল সংগ্রহ শেষে নিচের দিকে ঝুলে পড়া বয়স্ক অপ্রয়োজনীয় পাতা অপসারণ করতে হবে। গাছের গোড়া ও কান্ড থেকে গজানো শাখা বাড়তে দিলে গাছে ফলদান ক্ষমতা কমে যাবে। তবে চারা সংগ্রহের প্রয়োজনে গোড়ার কাছাকাছি গজানো কিছু সাকার রেখে অবশিষ্ট সাকারগুলো নিয়মিত ছেঁটে দিতে হবে। সংগৃহীত চারা বেশি ছায়ায় সংরক্ষিত থাকার কারণে চারা রোপণের পর সূর্যের তাপে খেজুর চারা ঝলসে না যায় এজন্য রোপণের প্রথম ১০-১৫ দিন উত্তর-পূর্ব দিক উন্মুক্ত রেখে পাতলা ছালা দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ভালোভাবে ঢেকে দিয়ে গাছকে হালকা ছায়া দেয়া প্রয়োজন হবে। বিকল্প ব্যবস্থায় গাছগুলোকে ১৮ ইঞ্চি বিশিষ্ট মাটির টবে উপযোগী পটিং মিডিয়া দিয়ে আধাছায়ায় ২-৩ মাস সংরক্ষণ করে পরে সেগুলো বাগানে রোপণ উপযোগী হবে।

সার প্রয়োগ

খেজুর গাছে ৪ মাসের ব্যবধানে নিয়মিত সার প্রয়োগ করা জরুরি। তাতে গাছ ভালোভাবে বাড়বে, বেশি ফল দানে সক্ষম হবে। নারিকেল, সুপারির মতো এরা পামী গোত্রীয় বলে পটাশ পছন্দ করে। বিভিন্ন বয়সের গাছে যে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন তা হলো-প্রতি বছরের জন্য সুপারিশকৃত সারগুলো ৩ ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রতি ডোজ মে-জুন মাসে একবার এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ও ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আরও দুইবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও অনু খাদ্যগুলো বিশেষ করে জিংক ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ফেরাল সালফেট ও বোরন ও আইরোল বছরে একবার করে গাছের বয়স বিবেচনায় প্রতি গাছে ২০০-৩০০ গ্রাম করে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সার প্রয়োগ করার পরপরই ভালোভাবে সেচ দিতে হবে। গাছের গোড়া ছেড়ে যে অংশে শিকড় ছড়ায় সে অংশে সার প্রয়োগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন সার প্রয়োগকালে গাছের শিকড় কম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ভালো ব্রান্ডের NPK বা NPKS মিশ্র সার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে গাছের প্রথম অবস্থার তুলনায় নাইট্রোজেন জাতীয় সার প্রয়োগ কিছু বেশি প্রয়োজন হয়। ফুল-ফল ধরা আরম্ভ করলে পটাশ ও ফসফরাসের পরিমাণ বাড়াতে হবে। অনেকে অনুখাদ্য সমৃদ্ধ কোনো কোনো সার পানিতে গুলে যায় এমন সার প্রয়োগ করে গাছকে সুস্থ রাখে।

পোকা ও রোগ দমন

খেজুরের শুটি মোল্ড রোগঃ শুটি মোল্ড রোগ হলে অনেক সময় পিপীলিকার উপস্থিতি দেখা যায়। হোপার বা মিলিবাগ এর আক্রমণ বেশি হলে শুটি মোল্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে, পাতায় কাল ময়লা জমে এবং এক পর্যায়ে গাছের ডালের ডগা মরে যায়।

ব্যবস্থাপনাঃ

- ✡ আক্রান্ত ডাল ও পাতা কেটে ফেলতে হবে।
- ✡ সময়মত প্রুনিং করে গাছ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ✡ সাইপারমেথ্রিন বা ইমিডাক্লোরোপ্রিড ১ মিলি./লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে হোপার বা মিলিবাগ দমন করতে হবে।
- ✡ সালফার ছত্রাক নাশক ৪ গ্রাম/লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

খেজুরের স্কেল বা খোসা পোকাঃ ছোট আকৃতির এ পোকা গাছের কচি পাতা হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এরা দুভাবে ক্ষতি করে থাকে। প্রথমতঃ রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছের রসের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ অন্তঃক্ষেপ করে। ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতাফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনাঃ

- ☆ সম্ভব হলে পোকাসহ আক্রান্ত অংশ অপসারণ করতে হবে।
- ☆ হাত দিয়ে পিশে বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে পোকা নিচে ফেলে মেরে ফেলতে হবে।
- ☆ আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আক্রান্ত গাছে ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা ফেনট্রোথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ক্লোরপাই-রিফস ২০ ইসি এর যে কোন একটি ১ মিলি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায় ।

খেজুরের গোবরে পোকাঃ এ পোকার আক্রমণে শীর্ষ পাতা শুকিয়ে য়ায়। ত্রিভুজের মত নকশা করে পাতা কাটে। পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের মাথায় আক্রমণ করে ও কান্ড ছিদ্র করে ঢুকে ভিতরের কোষ কলা খেতে থাকে।

ব্যবস্থাপনাঃ

- ● গোবর বা কমপোস্ট গাছের নিচ থেকে সরাতে হবে ।
- ● ছিদ্রে শিক ঢুকিয়ে খুচিয়ে পোকা মারতে হবে ।
- ● আক্রান্তগাছের নিচে মাটির চাড়িতে পচা খৈইল পানিতে গুলে বা ভেরেন্ডা বীজের গুড়া পানিতে জাল দিয়ে দ্রবণ তৈরী করে দিলে পোকা তার ভিতরে মারা যায় ।
- ● প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন বা ২ মিলি সুমিথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

খেজুর গাছে পরাগায়ন

খেজুর গাছের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদাভাবে জন্মে। এজন্য সুস্থ বড় ও ভালো মানের খেজুর ফলের জন্য ফুটন্ত স্ত্রী ফুলের ছড়া বের হওয়ার সাথে সাথে পুরুষ গাছের পরাগরেণু দিয়ে সময়মতো পরাগায়ন করা অত্যাবশ্যক। সুস্থ সবল বড় আকারের পুরুষ ফুল দানে সক্ষম এমন গাছ থেকে পুরুষ ফুল সংগ্রহ করে সাধারণ ফ্রিজ সংরক্ষণ করা হলে তা দুই বছর পর্যন্ত পরাগায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে তাজা পরাগরেণু ব্যবহার করা ভালো। খেজুর গাছে জানুয়ারি-মার্চ মাসে ফুল ফুটে। উভয় প্রকার ফুলের কাঁদি একটা শক্ত আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। আবরণের ভেতরে ফুল বড় হয়ে পরাগায়নের উপযোগী হলে বাইরের আবরণটা আস্তে আস্তে ফাটা শুরু হয়। এ অবস্থায় পুরুষ ফুলের কাঁদির আবরণ অপসারণ করে নিয়ে হালকা রোদে শুকিয়ে নিয়ে এ পরাগ রেণু সাবধানে আলাদা করে নিয়ে কাগজে মুড়িয়ে তা পলিথিন কভার দিয়ে ফ্রিজের নরমাল চেম্বারে সংরক্ষণ করতে হয়। এরপর স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের কাঁদি বড় হয়ে বাইরের শক্ত আবরণে ফাটল ধরা আরম্ভ করলে তা পরাগায়ন করার উপযোগী হয়। এ সময় ফাটল ধরা শক্ত আবরণ ধারালো ছুরি দিয়ে অপসারণ করে ছড়ার ভেতরের অংশ বের করে দামি নরম তুলি বা ব্রাশ দিয়ে সামান্য পরিমাণ পরাগ রেণু দিয়ে স্ত্রী ফুলে এ পরাগ রেণু হালকাভাবে ছুয়ে বা ঝেড়ে দিতে হয়। এ ছাড়া পুরুষ ফুলের দু-একটা ছাড়া স্ত্রী ফুলের আগায় বেঁধে রাখতে হয়। পরাগায়ন করা ফুলের ছড়া পাতলা ব্রাউন কাগজের ঠোঙা দিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিতে হয়। এর ৩-৪ সপ্তাহ পর আবরণটা সরিয়ে ফেলতে হয়। পরাগায়নকালে ছড়ার কাছাকাছি খেজুরের ছুঁচালো কাঁটাগুলো সিকেচার দিয়ে অপসারণ করে নিলে কাঁটার আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাগানে প্রতি ১৫-২০টা স্ত্রী গাছের জন্য একটা করে পুরুষ গাছ রাখার কারণে বাতাসের ও মৌমাছি বা উপকারী কীটপতঙ্গের মাধ্যমে পরাগায়ন কাজ সমধা হয়। এতে ৬০-৮০% পর্যন্ত ফল ধরানো সম্ভব।

ফল সংগ্রহ

পরাগায়ন করার ৩-৪ মাস পর খেজুর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। কতগুলো জাতের পুষ্ট কাঁচা-পাকা ফল উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। অন্য জাতের ফল পরিপক্ব অবস্থায় বাদামি/গাঢ় বাদামি/কালো রঙ ধারণ করলে তা সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার বা বাজারজাত করা হয়। একটা সুস্থ সবল গাছ থেকে বছরে জাতভেদে ৭০-১৫০ কেজি খেজুর ফল পাওয়া যায়। উত্তম ব্যবস্থাপনায় কোনো কোনো জাতের গাছে প্রায় ৩০০ কেজি পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে।



৮। জি-৯ কলার চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: গ্রান্ড নাইন (জি-৯) কলা
ইংরেজি নাম: Grand Naine (G-9) Banana
বৈজ্ঞানিক নাম: *Musa acuminata*

ভূমিকা

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফলের মধ্যে কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল। কলা বাংলাদেশের প্রধান ফল যা সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকলেই খাওয়ার সুযোগ পায়। বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে কলার চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং বার্ষিক মোট উৎপাদন ৮.০৭ লক্ষ মে. টন। কলা ক্যালরি, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ ও সুগন্ধী এবং পুষ্টিকর ফল।

কান্ট্রি অব অরিজিন ও জাতের বৈশিষ্ট্য

Grand Naine - গ্রান্ড নাইন (জি৯) এক ধরনের সাগর কলার মতোই উন্নত জাতের কলা যা সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্রান্ড নাইন (জি৯) একটি ক্যাভেন্ডি জাতীয় কলা যার প্রজাতি Musa acuminata ফরাসী ভাষায় 'Grand Nain' cv 'Grand Naine' কলার আভিধানিক অর্থ Large উদ্ভিদ বা বৃহৎ বামন। এর গাছ জায়ান্ট ক্যাভেন্ডিশ জাতের চেয়ে খাটো, কিন্তু ডোয়ার্ফ ক্যাভেন্ডিশ জাতের গাছের চেয়ে লম্বা। ইসরায়েল থেকে ১৯৯৫ সালে জি-৯ কলা আনা হয় ভারতে। বাংলাদেশে এ জাতের কলার চাষ শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে জি-৯ কলার টিস্যু কালচার চারার উৎপাদন ও বিক্রি করা হচ্ছে। উচ্চফলন ও অধিক সংরক্ষণকালের কারণে অনেকেই এখন জি-৯ জাতের কলা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ জাতের কলার চারা উৎপাদিত হয় টিস্যু কালচারের মাধ্যমে। সনাতন প্রথায় প্রচলিত জাতের কলা চাষ করতে গেলে রোগমুক্ত চারা সহজে মেলে না। কিন্তু টিস্যু কালচারের চারা সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত। জি-৯ জাতের কলা চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যেতে পারে। সারা দেশে মাঠে ও এককভাবে বাগান আকারে বাণিজ্যিকভাবে জি-৯ কলার চাষ করা যায়।

জি-৯ কলার বৈশিষ্ট্য

- এ জাতের কলার ফলন বেশি, সুস্বাদু ও রোগ প্রতিরোধী।
- একটি গাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি বা ২২০-২৪০টি কলা পাওয়া যায়, সেখানে প্রচলিত জাতের কলা পাওয়া যায় সর্বোচ্চ ৬০-১২০টি।
- দুই বছরে তিনবার ফল পাওয়া যায়। গাছ মাঝারি আকারের (২মিটার লম্বা) ও শক্ত হওয়ায় ঝড়-বাতাসে সহজে ভেঙে পড়ে না।
- এ জাতের কলা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহনশীল।
- গাছ থেকে কলা তোলার পর তুলনামূলকভাবে এই কলা বেশি দিন টিকে থাকে বা নষ্ট হয় না।
- কাঁদির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো কলার আকার এক রকম হয়।
- পাকা কলার রং আকর্ষণীয় হলুদ, লম্বা ও কম বাঁকানো, কলার গায়ে কোনো দাগ পড়ে না।

টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন:

(ক) ল্যাবরেটরিতে টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন: সারা বিশ্বে জি-৯ জাতের কলা সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয়। চাষকৃত এ জাতের কলার বিপুল পরিমাণ চারা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। টিস্যু কালচার বা কোষকলা আবাদ উদ্ভিদ বংশবিস্তারের একটি পদ্ধতি, যেখানে বীজের পরিবর্তে কোনো উদ্ভিদের এক বা একাধিক কোষগুচ্ছ থেকে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে আবাদের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়। কলাগাছের কন্দ বা করম, সাকার বা তেউড়, অসি তেউড় বা সোর্ড সাকার সাধারণত রোপণ দ্রব্য হিসেবে লাগানো হয়। এর বদলে গাছের কোষ বা টিস্যু ব্যবহার করা হয় চারা উৎপাদনের জন্য। সুস্থ, নীরোগ ও উন্নতমানের পরীক্ষিত মাতৃ কলাগাছের কোষ বা মেরিস্টেম নিয়ে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টেস্ট টিউবের মধ্যে কলার টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন করা হয়। এভাবে হাজার হাজার চারা ল্যাবরেটরিতে ঘরের মধ্যে উৎপাদন করা যায়। টেস্ট টিউবে উৎপাদিত ছোট চারাকে পরে পলিব্যাগে করে বড় করা হয়।

(খ) ঘরোয়া পরিবেশে টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন: ল্যাবরেটরিতে টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন করা ব্যয়সাধ্য ও অনেক কারিগরি বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হয়। কিন্তু যে কেউ চাইলে নিজের বাড়িতেও টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন করতে পারেন। অবশ্যই সেসব চারা কখনোই ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত চারার মতো শতভাগ রোগমুক্ত হবে না, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে চারা উৎপাদনের চেয়ে অনেক ভালো এবং একটি গাছ থেকে অনেকগুলো চারা উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করতে হলে জি-৯ জাতের কলাগাছের ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছ কেটে তার গোড়া বা মোথা তুলে নিয়ে আসতে হবে। এরপর মোথার শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে মোথা পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। মোথা থেকে যতগুলো চোখ আছে সেগুলো ধারাল চাকু দিয়ে চৌকা বক করে তুলতে হবে। চোখের আকার অনুযায়ী প্রতিটি বকের আকার ৪-৫ সেন্টিমিটার হতে পারে। বাড বা চোখগুলো ৫ লিটার পানিতে ১ চা-চামচ গুঁড়া সাবান গুলে তাতে ভালো করে ডুবিয়ে ও ধুয়ে শোধন করতে হবে। এতে কুঁড়ি বা চোখে কোনো রোগজীবাণু থাকলে সেগুলো নিষ্ক্রিয় হবে বা মরে যাবে। চারা তৈরির জন্য মিডিয়া বা মাধ্যম লাগবে। তাই ৭০% ধানের পোড়া তুষ ও ৩০% ভার্মিকম্পোস্ট বা দো-আঁশ মাটি একসাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেই চারা জন্মানোর মাধ্যম বা মিডিয়া তৈরি করতে হবে। একটি চৌকা ট্রেতে এই মাধ্যম বা তুষ-মাটি ভরতে হবে। পানির ছিটা দিয়ে তা ভিজাতে হবে। এরপর চোখগুলো সারি করে ৮-১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রেখে বসাতে হবে। চোখের পিঠ থাকবে উপরে। শুকনো পোড়া তুষ বা মাধ্যম ছিটিয়ে চোখগুলো ঢেকে দিতে হবে। পানির ছিটা দিয়ে তা ভিজাতে হবে। রোজই অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ট্রের মাধ্যম ও চোখ ভিজাতে হবে। এভাবে রেখে দিলে চোখগুলো থেকে চারা বের হবে। মাস খানেক বয়স হলে চারাগুলো রোপণের উপযুক্ত হবে।

মাঠে ও ঘেরের পাড়ে কলা চাষ প্রযুক্তি:

মাটি

মাঠে বাগান আকারে জি-৯ কলা চাষ করতে চাইলে পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত। উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি

জমি ভালভাবে গভীর করে চাষ করতে হয় এবং আগাছা মুক্ত করতে হবে। এরপর উঁচু বেড তৈরি করতে হবে।

সারি থেকে সারির দুরত্বঃ ৬ ফুট
চারা থেকে চারা দুরত্বঃ ৫ ফুট

গর্ত খননঃ প্রতিটি গর্ত ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারে খনন করতে হয়। চারা রোপণের মাসখানেক আগেই গর্ত খনন করতে হয়।

গর্তে সার প্রয়োগঃ

চারা রোপণেরপূর্বে গর্তের মাটির সাথে গর্ত প্রতি ১০ কেজি গোবর বা খামারজাত সার, ১০০-১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ -১৫০ গ্রাম এমওপি, ৫০ গ্রাম জিপসাম ও ১০ গ্রাম জিংক সালফেট সার মিশিয়ে গর্ত ভরে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। গর্তের মাটির সাথে গর্ত প্রতি ২৫০ গ্রাম নিম খইল ও ২০ গ্রাম দানাদার কীটনাশক (কার্বোফুরান জাতীয়) দিতে পারলে উপকার হয়, এতে মাটিতে কৃমি থাকলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গর্তের মাটি হালকা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

রোপণের সময়

বছরের যে কোনো সময় এ কলার চারা রোপণ করা যায়। কলার চারা বছরে ৩ মৌসুমে রোপণ করা উত্তম।
প্রথম রোপণঃ আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর)।
দ্বিতীয় রোপণঃ মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য-জানুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ)।
তৃতীয় রোপণঃ চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-মে)।

চারা রোপণ

পলিব্যাগে জন্মানো টিস্যু কালচারের চারা রোপণ করতে হবে। পলিব্যাগ কেটে ফেলে দিয়ে চারা গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে। রোপণের পর গর্তে সেচ দিতে হবে। চারার ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি হলেই তা রোপণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পলিব্যাগ বা ট্রেতে উৎপাদিত চারার বয়স ১ মাস হলে তা রোপণ করা যায়।

কলা গাছে সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারঃ গাছ প্রতি ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চারপাশে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে তখনই সেচ দেওয়া উচিত। এ ছাড়া, শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় কলা বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে তার জন্য নালা থাকা আবশ্যক।

অন্যান্য পরিচর্যা

তেউড় কাটাঃ মোচা আসার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় কোন তেউড় রাখা উচিত নয়। মোচা আসার পর গাছ প্রতি মাত্র একটি তেউড় বাড়তে দেয়া ভাল।

ঠেকনা দেওয়াঃ স্বাভাবিক ভাবে গাছ কাঁদির ভার সইতে পারে, তবে কাঁদি খুব বড় হয়ে গেলে বাঁশ দিয়ে ঠেকনা দেওয়া ভালো।

ফসল সংগ্রহ

ঋতুভেদে রোপণের ১২-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত এ জাতের কলা পরিপক্ব হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করলে কলার গায়ের শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়া কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। সাধারণত মোচা আসার পর ফল পুষ্ট হতে ২১/২-৪ মাস সময় লাগে। কলা কাটানোর পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে এবং কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

কলার পানামা রোগঃ এটি একটি ছত্রাকজনিত মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতা হলুদ রং ধারণ করে। পরবর্তী সময় পাতা বোঁটার কাছে ভেঙ্গে গাছের চতুর্দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায়। কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটে ও যায়। অভ্যন্তরীণ লক্ষণ হিসেবে ভাসকুলার বান্ডেল হলদে-বাদামী রং ধারণ করে।

প্রতিকারঃ

- আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের তেউড় রোপণ করা যাবে না।
- আক্রান্ত জমিতে ৩-৪ বছর কলা চাষ করা যাবে না।



কলার সিগাটোকা রোগঃ এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় বা ৪র্থ পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যায়। দাগগুলো বড় হয় ও বাদামী রং ধারণ করে। এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

প্রতিকারঃ

- আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ১ গ্রাম অটোস্টিন মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে।

কলার গুচ্ছমাথা রোগ/ভাইরাস রোগঃ এ রোগের কারণে কলা গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রস্থ এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাকানো এবং হলুদ রংঙের হয়। পাতার শিরার মধ্যে ঘন সবুজ দাগ পড়ে।

প্রতিকারঃ

- আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র গোড়াসহ তুলে পুড়ে বা পুতে ফেলা।
- ভাইরাসের বাহক পোকা (জাবপোকা ও থ্রিপস) দমনের জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক (এসাটাফ, টিডো, এডমায়ার) প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি হারে মিশিয়ে ব্যবহার করা।
- আক্রান্ত বাগান থেকে চারা সংগ্রহ করবেন না।
- সুস্থ সবল চারা রোপণ করা।

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকাঃ কলার পাতা ও ফলে বিটল পোকা কলার কচি পাতায় হাঁটাহাটি করে এবং সবুজ অংশ নষ্ট করে। ফলে সেখানে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। কলা বের হওয়ার সময় হলে পোকা মোচার মধ্যে ঢুকে কচি কলার ওপর হাঁটাহাটি করে এবং রস চুষে খায়। কলার গায়ে বসন্ত রোগের মতো দাগ হয়।

প্রতিকারঃ

- পোকা আক্রান্ত মাঠে বারবার কলা চাষ করা যাবে না।
- কলার মোচা বের হওয়ার সময় ছিদ্র বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম সেভিন ৮৫ ডব্লিউ-পি মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২ বার গাছের পাতার উপরে ছিটাতে হবে।

কলা গাছের কান্ডের উইভিলঃ পূর্ণবয়স্ক বিটল কলা গাছের গোড়ায় শিকড়ের উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে গ্রাব (বাচ্চা) বের হয় এবং ভেতরে ঢুকে যায়। ক্রমেই এটি উপর দিকে উঠে ও কান্ডের মাঝে কুরে কুরে খায় ও আক্রান্ত অংশ পঁচে যায় । আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে ডগার পাতা শুকিয়ে যায় এবং কোন কলা হয় না এবং গাছ মরে যায়।

প্রতিকারঃ

- বাগান পরিষ্কার রাখতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ তুলে নষ্ট করতে হবে ।
- আক্রমণ বেশি হলে দানাদার বালাইনাশক কার্বোফুরান ৫জি বা ডায়াজিনন ৬০ইসি অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে (১০ গ্রাম/গাছ)।

মসলা জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতি



৯. তেজপাতার চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: তেজপাতা
ইংরেজি নাম: Indian bay leaf
বৈজ্ঞানিক নাম: *Cinnamomum tamala*
পরিবারঃ Lauraceae

ভূমিকা

আমাদের দেশে তেজপাতা মসলা হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর তৈল সুগন্ধিযুক্ত। বাংলাদেশে উৎপাদিত তেজপাতার বেশির ভাগই মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও তেজপাতা সুগন্ধি তৈরিতে, কাশ্মীরে পানের বিকল্প হিসাবে এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশী তেজপাতার চাষ হয়, তবে সিলেট, চট্টগ্রামসহ পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে এর চাষ ভাল হয়।

ঔষধিগুণ

তেজপাতা বিরেচক, উদ্দীপক, মূত্রবর্ধক, তলপেটে সংকোচনজনিত ব্যাথা, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, গলায় সংক্রমক এবং সর্দি-কাশিতে ব্যবহার হয়। পাতা ব্যাকটেরিয়া বিধ্বংসী, জরায়ুর বিভিন্ন রোগনাশক এবং গর্ভফুল নিষ্কাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তেজপাতা অরুচি দূর করে। মাড়ির ক্ষত দূর করে। এর বাকল থেকে যে সুগন্ধি তেল পাওয়া যায় তা সাবান উৎপাদনে কাজে লাগে। ঘামাচি সারায় তেজপাতা ব্যবহার হয়, এছাড়াও বাকল ও পাতা ট্যানিন হিসেবে ব্যবহার হয়।

পুষ্টিগুণ

পাতায় প্রধান উপাদান হলো এক প্রকার উদ্বায়ী তেল যা ইউজিনল (প্রায় ৭৮%) নামে পরিচিত। তাছাড়াও পাতা আইসো ইউজিনল ডি-আলকা-ফেলা-নাড্রিনি এবং সিনানামিক অ্যালডিহাইড সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে ৬.৯-৩২% শর্করা, ৩.১ - ৩.৪% প্রোটিন, ১২-২৮% ফাইবার , ৬.৫-১৯.৯% পানি ও ১-৫.১% উদ্বায়ী তেল ।

জাত

বারি তেজপাতা -১: দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেজপাতার উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি ২০১৭-২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত হয় যা "বারি তেজপাতা-১" নামে পরিচিত। ইহা মাঝারী উচ্চতার (২.৫-৩.০ মিটার) সুগন্ধিযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাকল গাঢ় ধূসর অথবা কালো, সামান্য অমসৃণ। পাতাগুলো বিপরীতভাবে বিন্যস্ত, কচি অবস্থায় লাল এবং পরে সবুজ হয়ে যায়, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও তিন শিরা বিশিষ্ট। পাতাগুলো লম্বায় বেশ বড় ও সবুজ বর্ণের। "বারি তেজপাতা-১" সারাবছর বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। চারা লাগানোর ১৬-১৮ মাসের মধ্যে তেজপাতা সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের তেজপাতার গাছের ০.৫ ঘনমিটারে গড়ে ১৫৮১.২৫- ১৭০৬.০০ টি এবং এক মিটার লম্বা ডালে ৯৭.০০-১০১.৮০টি পাতা পাওয়া যায়। একটি পাতায় গড় দৈর্ঘ্য ১৪.৮০-১৫.০৫ সেমি ও প্রস্থ ৩.৮৩-৩.৯৩ সেমি। পাতার পুরুত্ব গড়ে ০.৫৯-০.৬৯ মিমি। পাতার বোটার দৈর্ঘ্য গড়ে ১.০৫-১.৪৭ সেমি। পাতায় শুষ্ক পদার্থের পরমাণ গড়ে ৫৯.২৮-৬২.০% হয়। জাতটিতে লিফস্পট/পাতা পোড়া রোগ অন্যান্য স্থানীয় জাতের তুলনায় অনেক কম হয়। জাতটির ৭-৮ বছর বয়সের একটি গাছ হতে বছরে গড়ে ৩০.০০-৩৪.২৩ কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদন হয়।

জন্মস্থান/উৎস

তেজপাতার বৈজ্ঞানিক নাম Cinnamomum tamala যার আদি উৎস হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ও ভারতের উত্তর পূর্ব পাহাড় হতে বার্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। তেজপাতা বাংলাদেশসহ ভূমধ্যসাগর, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চায়না ও বার্মায় উৎপাদিত হয়।

মাটি ও জলবায়ু

প্রায় সব ধরনের মাটি ও আবহাওয়ায় তেজপাতা জন্মাতে পারে, তবে সুনিষ্কাশিত গভীর বেলে দোআঁশ মাটি তেজপাতা চাষের জন্য আদর্শ। তবে জমির প্রকৃতি অবশ্যই উঁচু হতে হবে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু তেজপাতা চাষের জন্য সর্বোত্তম। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৮০০-৩০০০ মিমি ও গড় তাপমাত্রা ২৮-৩৫০ সে. হলে পাতার ফলন ও গুণগতমান উভয়ই ভাল হয়। তেজপাতার পরিবেশ উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব। তবে বাংলাদেশের সর্বত্রই সব ধরনের মাটিতেই বারি তেজপাতা-১ চাষ করা যায়।



বংশবিস্তার

তেজপাতার দু'ভাবে বংশবিস্তার করা যায়। বীজ থেকে এবং কলম থেকে চারা তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

বীজ হতে চারা উৎপাদন: তেজপাতা বীজ থেকে চারা তৈরী করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বীজের ডরমেনসি খুবই কম হওয়ায় বীজ সংগ্রহের ১-২ দিনের মধ্যে বীজ চারা তৈরী করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। বীজ পেকে যখন কালো বর্ণ ধারণ করবে, তখন বুঝতে হবে বীজ সংগ্রহের সঠিক সময়। এই সময়েবীজ সংগ্রহ করে প্রস্তুতকৃত মাটি ভর্তি প্রতিটি পলিব্যাগে ২-৩ বীজ দিতে হবে। বীজ বপনের পর পলিব্যাগে সেভিন পাউডার ব্যবহার করতে হবে। এতে করে পিঁপড়া বীজের ক্ষতি করতে পারবে না। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে চারা হতে ১২-১৪ দিন সময় লাগে। এর পর হতে wbqwgZ পানি দিতে হবে, যাতে মাটিতে সবসময় আর্দ্রতা বজায় থাকে।

কলমের মাধ্যমে চারা তৈরিকরণ: সাধারণত পার্শ্বীয় জোড় কলম (Side grafting) ব্যবহার করে চারা তৈরি করা হয়। সাধারণত কাবাব চিনির চারাকে রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পলিব্যাগে/মাটির ছোট টবে কাবাব চিনির চারা তৈরি করে নেয়া হয়। চারা ১.৫-২.০০ ফুট Dufl হলে তখন কলমের জন্য উপযুক্ত হয়। মধ্য চৈত্র-বৈশাখ হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত (এপ্রিল-মে) কলম করার উপযুক্ত সময়। নির্বাচিত তেজপাতার শাখাকে (পেনসিলের মতো মোটা) সায়ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এরপর কলম করা হয়।

চারা রোপণ

একর প্রতি ৩০০টি চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৪-৬ মিটার দূরত্বে ৮০ সেমি. x ৮০ সেমি. x ৮০ সেমি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি ও ৫০ গ্রাম জিপসাম সারপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে।বিকেলের দিকে সতেজ ও পুষ্ট চারা লাগাতে হবে। মাদার দূরত্ব-৬ মিটার, মাদার চওড়া ও গভীরতা- ৬০ সেমি.। লাগানোর পর চারার গোড়ার মাটি অল্প চেপে দিতে হবে। কোন চারা মরে
গেলে সেই জায়গায় নতুন চারা লাগিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো।

গাছের বয়স	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ				
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১ -২ বছর	১২	২৫০	২০০	২০০	৫০
৩-৪ বছর	১৭	৪০০	৩৫০	৩৫০	৮০
৫ -৬ বছর	২২	৬৫০	৬০০	৬০০	১২০
৭ -৮ বছর	২৭	৮৫০	৭৫০	৭৫০	১৬০
৯ বা তদুধ্ব	৩২	১০৫০	৯৫০	৯৫০	২০০

এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সেসব সারও প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান দুই কিস্তিতে পাতা সংগ্রহের পর পর প্রয়োগ করতে হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

পানি, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে পাতার বাড়ন্ত অবস্থায় সেচ দিলে ফলন ও পাতার গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। মাটির আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে খরিফ-১ এ ২-৩ টি এবং রবি মৌসুমে ৪-৫ টি সেচ দিতে হয়। চাষ দিয়ে বা কোঁদাল দিয়ে কুপিয়ে তেজপাতার বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

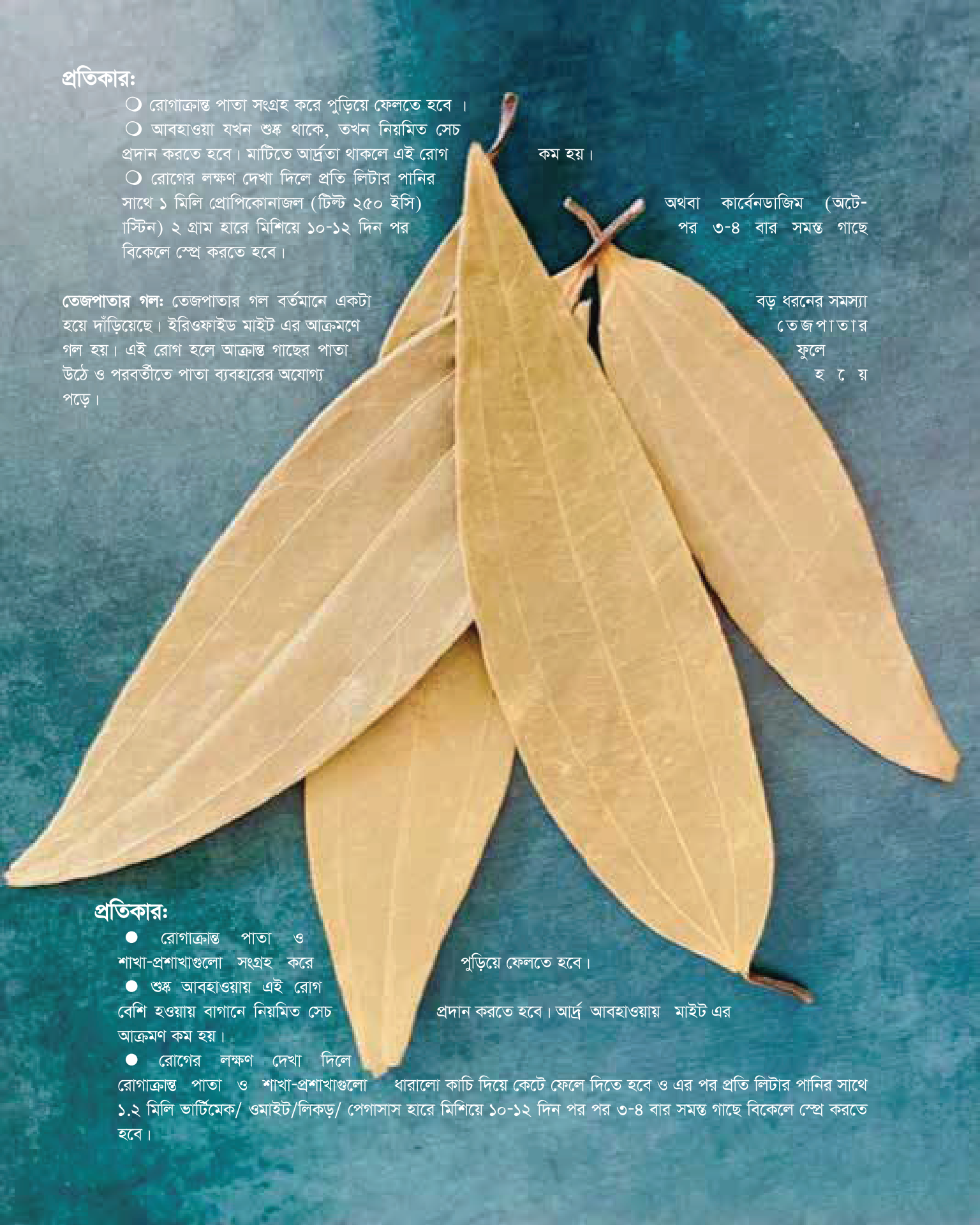
পাতা সংগ্রহ: সাধারণত বছরে ২ (দুই) বার পাতা সংগ্রহ করা হয়। গাছ হতে তেজপাতা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের ছোট ছোট ডাল না ভেঙ্গে যায়। আবহাওয়া অনুকূল ও পরিমিত পরিচর্যা করলে ৭-৮ বছরের একটি গাছ হতে বছরে প্রায় ৩০-৩৫ কেজি উৎপাদন হবে।
চারা লাগানোর ৪-৫ বৎসর পর থেকে প্রত্যক শীতকালে পাতা সংগ্রহ করা যায় এবং ১টি গাছ থেকে ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ফসল বাজারজাতকরণ কৌশল

গাছ থেকে পাতা তোলার পর ৫-৭ দিন ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বিক্রয়ের জন্য বস্তায় ভরা হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

তেজপাতায় রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা লক্ষণীয় নয়। তেজপাতার রোগের মধ্যে গ্রে লিফ স্পট/পাতা পোড়া রোগ প্রধান। এই রোগ হলে তেজপাতার ফলন অনেকাংশে কমে যায়। তেজপাতার ব্যবহারের প্রধান অংশ পাতা হওয়ায় রোগের কারণে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে ফলন ৯০% পর্যন্ত কম হতে পারে। তেজপাতার এই রোগ ছত্রাকের কারণে হয়। পাতায় প্রথমে ছোট ছোট গোলাকার দাগ বা স্পট পড়ে। পরে দাগগুলো বড় হতে থাকে ও অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে মনে হয় পাতাটি আগুনে পুড়ে গেছে। পাতাটি তখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।



প্রতিকারঃ

❍ রোগাক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।

❍ আবহাওয়া যখন শুষ্ক থাকে, তখন নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। মাটিতে আর্দ্রতা থাকলে এই রোগ কম হয়।

❍ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল (টিল্ট ২৫০ ইসি) অথবা কার্বেনডাজিম (অটে-াস্টিন) ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার সমস্ত গাছে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

তেজপাতার গলঃ তেজপাতার গল বর্তমানে একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরিওফাইড মাইট এর আক্রমণে তেজপাতার গল হয়। এই রোগ হলে আক্রান্ত গাছের পাতা ফুলে উঠে ও পরবর্তীতে পাতা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকারঃ

● রোগাক্রান্ত পাতা ও শাখা-প্রশাখাগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

● শুষ্ক আবহাওয়ায় এই রোগ বেশি হওয়ায় বাগানে নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। আর্দ্র আবহাওয়ায় মাইট এর আক্রমণ কম হয়।

● রোগের লক্ষণ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পাতা ও শাখা-প্রশাখাগুলো ধারালো কাচি দিয়ে কেটে ফেলে দিতে হবে ও এর পর প্রতি লিটার পানির সাথে ১.২ মিলি ভার্টিমেক/ ওমাইট/লিকড়/ পেগাসাস হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার সমস্ত গাছে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

১০. দারুচিনির চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: দারুচিনি
ইংরেজি নাম: Cinnamon
বৈজ্ঞানিক নাম: Cinnamomus zeylanicum

ভূমিকা

দারুচিনি একটি মসলা জাতীয় ফসল। চির সবুজ মাঝারি আকারের ঝোপালো শাখাযুক্ত এ গাছ ১০-১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। দেখতে কিছুটা তেজপাতা বৃক্ষের মতো এই বৃক্ষের চামড়াটা মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধিগুণ

দারুচিনি জীবাণুনাশক, রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধী, এটি ব্যাথানাশক, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ কমায়। দারুচিনি মসলা হিসাবে, ঔষধশিল্পে, বেভারেজে, পারফিউমে, কসমেটিক ও সাবান প্রস্তুতিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। দারুচিনি গাছের প্রায় প্রতিটি অঙ্গ যেমন- বাকল, পাতা, কুঁড়ি, ফুল, ফল ও শেকড় কোন না কোন কাজে লাগে। এর বাকল উত্তেজক ক্ষুধাবর্ধক এবং বমি নিবারক।

পুষ্টিগুণ

দারুচিনির বাকলে রয়েছে চিনামালডিহাইড, চিনামিক অ্যাসিটেট, চিনামাইল অ্যালকোহল ও আরো উদ্বায়ী তৈল যা এর সুগন্ধ, মিষ্টতা ও ঝাঁঝের জন্য দায়ী।

জাত

সারা বিশ্বে দারুচিনির বেশ কয়েকটি জাত চাষ হয়ে থাকে। এদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যথা- সিনোল বা প্রকৃত দারুচিনি এবং জংলী বা ঝুটা দারুচিনি। প্রকৃত দারুচিনি বাদমি রঙের, অধিক সুঘ্রাণযুক্ত, পাতলা, মসৃণ, বেশি সুস্বাদু ও মিষ্টি। শ্রীলংকায় প্রকৃত দারুচিনির উৎপাদন বেশি হয়। আর জংলী দারুচিনির মধ্যে চীনা, সায়গন, ইন্দোনেশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, ভারতীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সারাদেশে চাষযোগ্য দারুচিনির একটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে, যা বারি দারুচিনি -১ নামে পরিচিত।

জন্মস্থান/উৎস

দারুচিনির আদি উৎস শ্রীলংকা। বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ ভালো মানের দারুচিনি শ্রীলংকায় উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে দারুচিনি বর্তমানে সাফল্যের সাথে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া দারুচিনি চাষের জন্য উপযুক্ত। দেশের সর্বত্র বিশেষ করে পার্বত্য এলাকার অম্লধর্মী মাটি সমৃদ্ধ পাহাড়ের পতিত ঢালে খুব সহজেই দারুচিনির বাণিজ্যিক বাগান করা যেতে পারে।

আবহাওয়া ও মাটি

সাধারণত উষ্ণ ও অবউষ্ণ আবহাওয়া দারুচিনি চাষের জন্য উপযোগী। সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী ও পর্যাপ্ত সুর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

জমি তৈরি

যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমি দারুচিনি চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পারিষ্কার করে নিলেই চলবে।

চারা তৈরি

দারুচিনি সাধারনত বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে কলমের মাধ্যমে ও এর চারা তৈরি করা হয়ে থাকে। কলমের ক্ষেত্রে গুটি কলম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দারুচিনি গাছে সাধারনত জানুয়ারি মাসে ফুল আসে। জুলাই মাস থেকে আগস্ট মাসে ফসল আসা শুরু করে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে দারুচিনি চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ১ মিটার দূরত্বে সারিতে ৬০ সেমি দূরে দূরে ৩০ × ৩০ × ৩০ সেন্টিমিটার মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ৫-১০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১-২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত দারুচিনি চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছের সার প্রয়োগ

গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বাড়বে। প্রতিটি গাছের জন্য ৪/৫ কেজি কম্পোস্ট বা পঁচা গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন ও সেচ

গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। চারা রোপণের প্রথম দিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। গাছ বড় হয়ে গেলে আর সেচের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

দারুচিনি গাছের পরিচর্যা

দারুচিনির বাগানে নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে গাছের গোড়ায় যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাগানের আগাছা নিয়মিত পরিষ্কার করে গাছের গোড়ায় মালচিং বা জাবড়া প্রয়োগ করে খরা মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা যায়। গাছ ১৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হলে উপরের কান্ড গুলো ছেঁটে দিতে হবে। প্রধান কান্ড গুলো থেকে বের হওয়া পার্শ্ব বিটপগুলো বারবার ছেটে দিতে হবে। এতে ২ মিটার উচ্চতায় ঝোপের সৃষ্টি হবে। চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

দারুচিনির বাকল সংগ্রহ ও শুকানো

গাছের বয়স ৩ বছর পার হলেই গাছের বাকল সংগ্রহ করা যায়। এ সময় গড়ে গাছ ২ মিটার লম্বা হয় ও গাছের গোড়া ১০-১২ সেমি. মোটা হয়। এপ্রিল-মে মাসে একবার এবং নভেম্বর মাসে আর একবার অর্থাৎ বছরে ২ বার বাকল উঠানো যায়। দারুচিনি গাছ ২ ইঞ্চি পরিমাণ মোটা (ব্যাস) বা দুই বছর বয়স হলে তা গোড়া থেকে ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সেমি উপরে কেটে বাঁকানো ছুরি দিয়ে ছাল আলাদা করে নিয়ে হালকা রৌদ্রে বা ওভেনে ৫০°সে. তাপে ভালভাবে শুকিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত সকাল বেলা ১-৩ সেমি. ব্যাসের এবং ১.৫-২ মিটার পরিমাণ লম্বা করে ডাল কেটে এনে পাতা ও ডগা ছেঁটে ফেলে গোছা বেঁধে স্তুপ করে রাখা হয়। এতে ডালের সংগে লেগে থাকা অবশিষ্ট পাতাগুলোও ঝরে যায়। গোড়া থেকে এভাবে ডাল কেটে ফেললে আবার ডালপালা গজায় এবং পরের বছর আবার বাকল সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়। কর্তিত ডালগুলোর বাকল হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে থেঁতলে বা ঢিলা করে দিলে বাকলের ভেতরের স্তর কাগজের মতো রোল করে উঠে আসবে। আবার বিশেষ ধরনের ছুরি (যার ধারালো ফলার সামনের দিকটা গোল ও অল্প বাঁকানো এবং সামান্য খাঁজ কাটা) দিয়েও ডাল থেকে বাকল ছাড়ানো হয়। বাকলের বাইরের অমসৃণ ছাল ঘষে বা ছাড়িয়ে তুলে দেয়া হয়, তারপর পিতলের দা দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করা হয়। এরপর ডালটির একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বিভাবে চিরে দেওয়া হয়। ঐ বিশেষ ধরনের ছুরির সাহায্যে কাষ্ঠল অংশ থেকে বাকল আলাদা করা হয়। ডাল যেদিন কাটতে হবে বাকল সেদিনই উঠাতে হবে। উঠানো বাকলগুলো ছায়াযুক্ত জায়গায় সারারাত গাদা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর এগুলোকে একদিন ছায়ায় শুকানোর পরে ৪-৫ দিন বাঁশের চাটাই বা পলিথিনের ওপর রেখে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। বাকলের বাইরের খসখসে স্তর ফেলে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলে চোঙ্গাকৃতি নলের মতো বা কুইল হয়ে যায়। ছোট নলগুলো বড় নলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যৌথ নল বানানো হয় তাতে করে ওগুলো ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কা কম থাকে। গাছের মোটা ডাল থেকে চেঁছে নিয়ে চাঁছা দারুচিনি এবং বিভিন্ন শ্রেণির দারুচিনি গুঁড়ো করে গুঁড়ো দারুচিনি বানানো হয়।

সংরক্ষণ

সংরক্ষণের জন্য ভালো মানের দারুচিনি গ্রেডিং অর্থাৎ আলাদা করতে হবে। পাতলা, মসৃণ ও বাদামি রঙের বাকলকেই ভালো বা উঁচুমানের দারুচিনি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঘরের শীতলতম এবং শুষ্কস্থানে বা বড় পাত্রের মুখ এঁটে কয়েক মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তাছাড়া ফ্রিজে রেখেও দারুচিনি সংরক্ষণ করা যায়। খোলা অবস্থায় বাতাসের সংস্পর্শে রাখলে দারুচিনির ঘ্রাণ সৃষ্টিকারী সিনামালডিহাইড নামক রাসায়নিক পদার্থ আস্তে আস্তে উড়ে যায়।

ফলন

দারুচিনির প্রথম অবস্থায় প্রতিবার কর্তনে হেক্টরপ্রতি ১৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি এবং পরবর্তীতে ৩০০-৩৫০ কেজি পর্যন্ত দারুচিনি ছাল পাওয়া যেতে পারে।



রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা:

দারুচিনির শুটিমোল্ড রোগঃ এ রোগের আক্রমণে পাতায়, ফলে ও কান্ডে কাল ময়লা জমে। মিলিবাগ বা সাদা মাছির আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করা।
- মিলিবাগ বা সাদা মাছির আক্রমণ এ রোগ ডেকে আনে তাই এদের দমনের জন্য এডমায়ার ১ মিলি./লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।
- টিল্ট ২৫০ ইসি ১০ লি. পানিতে ৫ মি.লি. মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করা।

দারুচিনির লাল মরিচা রোগঃ এ রোগের আক্রমণে পাতায়, ফলে ও কান্ডে লালচে মরিচার মত একধরনের উচু দাগ দেখা যায়। একধরণের সবুজ শৈবালের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ব্যবস্থাপনাঃ

- আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করা।
- বাগান পরিচ্ছন্ন রাখবেন।
- কপার বা কুপ্রাভিট ১০ লি. পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করা।

১১. গোলমরিচের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: গোলমরিচ
ইংরেজি নাম: Black pepper
বৈজ্ঞানিক নাম: Piper nigrum

ভূমিকা

গোলমরিচ বহুবর্ষজীবী লতা জাতীয় গাছ। চির সবুজ পাতা অনেকটা পানের মতো। গোলমরিচ গাছের আকর্ষি দিয়ে সহায়ক গাছকে আকড়িয়ে থাকে। ইহা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের চির হরিৎ বনভূমির একটি দেশিয় গাছ। এদের ফলকে শুকিয়ে মসলা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ঔষধিগুণ

গ্যাসট্রিক, কফ, ঠান্ডাজনিত সমস্যায়, ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ব্যাহত করতে, ওজন কমাতে গোলমরিচ বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পুষ্টিগুণ

গোলমরিচে অনেক পরিমানে মেন্থল আছে। শুকনো গোলমরিচের (০.৩-০.৪%) - এ সাধারণত মেন্থল (৭-৪৮%), মেন্টোন (২০-৪৬%), মিথাইল অ্যাসিটেট (৩-১০%), মেন্থোফুরান (১-১৭%) এবং ১,৮-সিনোল (৩-৬%) সমন্বিত উদ্বায়ী তেল থাকে। এছাড়াও limonene, pulegone, caryophyllene এবং pinene সহ অনেক যৌগ সামান্য পরিমাণে রয়েছে।

জাত:

জৈন্তিয়া গোলমরিচ: জৈন্তিয়া গোলমরিচ জাতটি মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কা থেকে আনা বিভিন্ন জাত থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হয়। এ জাতটি ভালো বাউনি পেলে ১০-১১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। স্বাদ ঝাল, দানা পুষ্ট ও বড় আকৃতির। গাছপ্রতি ফলন ১.২৫-১.৫০ কেজি শুকনা গোলমরিচ।

জন্মস্থান/উৎস: গোলমরিচ গাছের আদি উৎস দক্ষিণ ভারত। পৃথিবীর উষ্ণ ও নিরক্ষীয় এলাকায় এটির চাষ হয়ে থাকে। গোল মরিচের গুঁড়া পশ্চিমা (ইউরোপীয়) খাদ্যে মসলা হিসাবে ব্যবহার করা হয় প্রাচীন কাল থেকে।



মাটি

গোলমরিচের জন্য পাহাড়ী উর্বর দোআঁশ মাটি প্রয়োজন এবং দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বংশ বিস্তার

কেবল অযৌন পদ্ধতিতে গোলমরিচের বংশ বিস্তার হয়।

চারা নির্বাচন

সেন্ট্রাল সিডার যা প্রধান গাছের গোড়া থেকে গজায় এমন লতা থেকে চারা (কাটিং) সংগ্রহ করাই উত্তম। কমপক্ষে ৩-৪টি গিঁটসহ ৩০-৪৫ সেমি লম্বা শাখা কাটিং হিসেবে নিতে হবে। কাটিংগুলো সরাসরি সহায়ক গাছের গোড়ায় লাগানো যেতে পারে এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়। বীজতলায় কাটিং লাগালে ২০-৩০ দিনের মধ্যে নতুন কুঁড়ি বের হতে শুরু করে। এক বছর বয়সের কাটিংবাগানে লাগানো উত্তম।

চারা রোপণ

মে-আগস্ট মাসে প্রত্যেক সহায়ক বৃক্ষের পাশে তৈরি গর্তে ২-৩ টি কাটিং লাগাতে হবে এরপর পানি দিতে হবে। কাটিংগুলি সহায়ক বৃক্ষের উত্তর পার্শ্বে লাগানো হলে সূর্যের তাপ কম লাগবে। সূর্য তাপ হতে প্রাথমিকভাবে রক্ষার জন্য পাতাওয়ালা গাছের ডাল বা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁঠাল, সুপারী, জিগা, সজিনা, শিমুল ইত্যাদি সহায়ক আশ্রয়দাতা গাছ বৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোপণ দূরত্ব

গাছ রোপণের দূরত ৪ মি. ও প্রতি বেডে সারির দূরত্ব ৪ মি.। গাছের গোড়ার গর্তের আকার ৩০ সেমি X ৩০ সেমি ৩০ সেমি।

সার প্রয়োগ

গাছের বৃদ্ধি এবং ভালো ফলন পেতে হলে সময়মতো প্রয়োজনীয় সার উল্লিখিত হারে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের সময় সারের পরিমাণ।

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ	গাছ প্রতি সার প্রয়োগ	
		প্রথমবার (বর্ষার শুরুতে)	দ্বিতীয়বার (বর্ষার শেষে)
গোবর বা কম্পোস্ট (কেজি)	১০	-	-
খৈল (গ্রাম)	২৫০	-	-
টিএসপি (গ্রাম)	১১৫	-	-
ইউরিয়া (গ্রাম)	-	৫০	৫০
মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)	১১৫	-	-

বয়স অনুযায়ী গাছপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের সময় নিচে দেয়া হল।

সারের নাম	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর
গোবর বা কম্পোস্ট (কেজি)	-	৫	-	৫
টিএসপি (গ্রাম)	-	২৫০	-	-
ইউরিয়া (গ্রাম)	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫
মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)	৫০	৫০	৫০	৫০

সেচ পদ্ধতি

রোপণের সময় মাটি শুকনো থাকলে সেচ দিতে হবে। খরা মৌসুমে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে মাটিতে সব সময়ে রস থাকে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি ছিদ্রযুক্ত কলসি অথবা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পানি ভর্তি করে সহায়ক গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ছিদ্র দিয়ে সারাক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকলে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলের জন্য সবচেয়ে উপকারী। অতি বৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সেজন্য নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।



গাছের পরিচর্যা

গোলমরিচ গাছের শাখা-প্রশাখা বেড়ে অতিরিক্ত ঝোপ হয়ে গেলে তা সামান্য পরিমাণে ছেঁটে পাতলা করে দিতে হবে। প্রথম পাঁচ বছর গোলমরিচ গাছের তেমন কোন ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে ফসল সংগ্রহের সুবিধার জন্য লতার আগা কেটে দেয়া যেতে পারে। এতে পার্শ্ব শাখাগুলো মজবুত এবং অধিক ফল দেয়। বর্ষা মৌসুমে গোলমরিচ গাছ যেন প্রচুর আলো-বাতাস পায় সেজন্য প্রয়োজনমতো সহায়ক গাছ বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ছেঁটে দিতে হবে।

মাড়াই ও ফলন

লতা রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে ফসল ধরা শুরু হয়। একটি গাছ পূর্ণ উৎপাদনের অবস্থায় আসে ৭-৮ বছর বয়সে এবং ২০ বছর পর্যন্ত ভাল ফলন দেয়। গোলমরিচ গাছে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথমার্ধে ফুল আসে। ১০-১৫ সেমি লম্বা গুচ্ছে খুব ছোট হলুদ ফুল ফোটে যা পরবর্তী সময়ে পাকা বেরিতে (ফল) রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর (মধ্য-অগ্রহায়ণ থেকে মধ্য-পৌষ) মাসের শেষ ভাগে যখন ২-১টি ফল লাল হয় তখনই সম্পূর্ণ গুচ্ছটি কেটে নিত হয়। পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ গড়ে ২.৫-৩ কেজি কাঁচা গোল মরিচ ফলন দেয় যা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শুকানোর পর গড়ে ১.২৫-১.৫০ কেজি হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

গোলমরিচের গোড়া পচা রোগঃ এ রোগ দেখা দিলে ডায়াথেন ৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২-৫ গ্রাম হারে ৭ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে। গোলমরিচে লাল ও কালো পিপড়ার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এদের ধ্বংস করতে হবে।

গোল মরিচের লাল মরিচা রোগঃ এ রোগের আক্রমণে পাতায়, ফলে ও কান্ডে লালচে মরিচার মত একধরনের উচু দাগ দেখা যায়। একধরণের সবুজ শৈবালের আক্রমণে এ রোগ হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাটাই করে ধ্বংস করা।
- কপার বা কুপ্রাভিট ১০ লি. পানিতে ২০ গ্রাম মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করা।
- বাগান অপরিচ্ছন্ন রাখবেন না।
- নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করা।



১২. এলাচের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: এলাচ
ইংরেজি নাম: Cardamon
বৈজ্ঞানিক নাম: *Elettaria cardamomum*

ভূমিকা

এলাচ মসলা জাতীয় ফসল যার ব্যবহার মিষ্টি বা ঝাল সব রকম খাবারেই দেখা যায়। এটি মূলত আদা জাতীয় গাছ এবং গাছের পাতাগুলো একটু বেশি লম্বা ও চওড়া। এই গাছের গোড়ার দিক থেকে লম্বা ফুলের স্টিক বের হয়। এই ফুলের ফলই হচ্ছে এলাচ। এলাচকে বলা হয় মসলার রানী। এলাচ সুগন্ধিযুক্ত একটি মসলা। খাবারে অতিরিক্ত স্বাদ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় এলাচ।

ঔষধিগুণ

এলাচের প্রধান সুবিধা হল এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য দেখায়। এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ নিরাময়ে উপকারী ।

পুষ্টিগুণ

শুষ্ক ৩১১ কিলোক্যালরি, প্রোটিন ১০.৭৬ গ্রাম, মোট চর্বি ৬.৭ গ্রাম, কোলেস্টেরল ০ মিগ্রা, খাদ্য তালিকাগত ফাইবার ২৮ গ্রাম। এলাচ পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজগুলির একটি ভাল উৎস। ১০০ গ্রাম পডে এই ইলেক্ট্রোলাইট ১১১৯ মিলিগ্রাম থাকে। পটাসিয়াম কোষ এবং শরীরের তরলগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

জাত

এলাচ (Cardamon) সাধারণত বড় ও ছোট এ দুই ধরনের হয়ে থাকে। উভয় জাতের এলাচ এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহা-সাগরীয় দীপপুঞ্জের শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। বড় এলাচের ৫০ প্রজাতির মধ্যে এই উপমহাদেশে বহু আগে থেকে বেশ কয়েকটি প্রজাতির ফলন হয়। সিলেট অঞ্চলে যে এলাচ জন্মায় তার নাম মোরঙ্গ এলাচ। সিলেট ও চট্টগ্রামের কিছু এলাকায় এলাচ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

মাটি

মাটিতে পিএইচ এর পরিমাণ ৬ এর বেশি হলে মাটির সাথে পরিমাণ মতো চুন মিশাতে হবে। যদি এটেল মাটি হয় এবং জমিতে বালির পরিমাণ কম থাকে তাহলে অতিরিক্ত বালি মেশাতে হবে। কিন্তু দোআঁশ মাটিতে কোন কিছু করতে হবে না। মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ কম থাকলে পচা গোবর বা কেঁচো কম্পষ্ট সার অতিরিক্ত হরে প্রয়োগ করতে হবে। উর্বর মাটি এবং হালকা রোদ্র-ছায়া যুক্ত জায়গায় এলাচ গাছ ভালো জন্মায়। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ছায়ার মধ্যে এলাচ গাছের ফলন ভালো হয়। এলাচ চাষের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো জমির প্রয়োজন হয় না। অন্য গাছের ছায়ার নিচে অর্থাৎ মেহগনি, আকাশমনি বা এ জাতীয় বাগানের ভিতর (গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে) অথবা বাড়ির উঠান অথবা বাগানে এলাচ চাষ করলে এলাচের ভালো ফলন হয়।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে বংশবিস্তার: সুস্থ ও উচ্চ ফলনশীল গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজের হার-৬০০ গ্রাম/হেক্টর (ফ্রেশ বীজ)। ২০ মিনিটের জন্য বাণিজ্যিক গ্রেড সালফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। পানি দিয়ে বীজ ধুতে হবে। ভাল পচা গবাদি পশুর সার, কাঠের ছাই এবং জঙ্গলের মাটি সমান পরিমাণে দিয়ে বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। বীজতলায় বীজ বপন করে এবং বালির একটি পাতলা স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বীজতলায় মালচিং এবং ছায়া দেওয়া যেতে পারে। বীজতলা আর্দ্র রাখা উচিত কিন্তু খুব ভেজা না। বীজ বপনের এক মাস পরে অঙ্কুরোদগম শুরু হয় এবং তিন মাস পর্যন্ত চলতে থাকে।

চারা রোপণ

শতক প্রতি ১৪টি এলাচের চারা লাগে অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৪৬০টি চারা রোপণ করা যায়।

চারা রোপণের দূরত্ব

এলাচের চারা লাইনে রোপণের জন্য চারা থেকে চারার দুরত্ব হবে ৪ হাত এবং লাইন থেকে লাইনের দুরত্ব হবে ৩.৫ (সাড়ে তিন) হাত। এই রোপণ দূরত্ব অনুসারে এলাচের চারা রোপণ করা ভালো।

সার প্রয়োগ

জমি তৈরির সময় চাষের সঙ্গে টিএসপি, প্রতি শতকে মাটিতে ৫০০ গ্রাম, পটাশ প্রতি শতকে ৫০০ গ্রাম। দানাদার কীটনাশক যেমন (ফুরাডান বা কার্বফুরান) ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে ২ কেজি পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। তারপর ১ দিন পর সেচ দিয়ে জমি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। যেন জমির সাথে সারগুলো ভালোভাবে মিশে যেতে পারে। ভালো ফলন পেতে হলে এর ১৪ দিন পরে ২ ফুট চওড়া ও ১.৫ ফুট গভীর গর্ত করে গোবর সার বা জৈব সার প্রয়োগ করে সাথে দানাদার কীটনাশক (প্রতি গর্তের গোবরের সাথে ২০০ গ্রাম) অবশ্যই দিতে হবে।

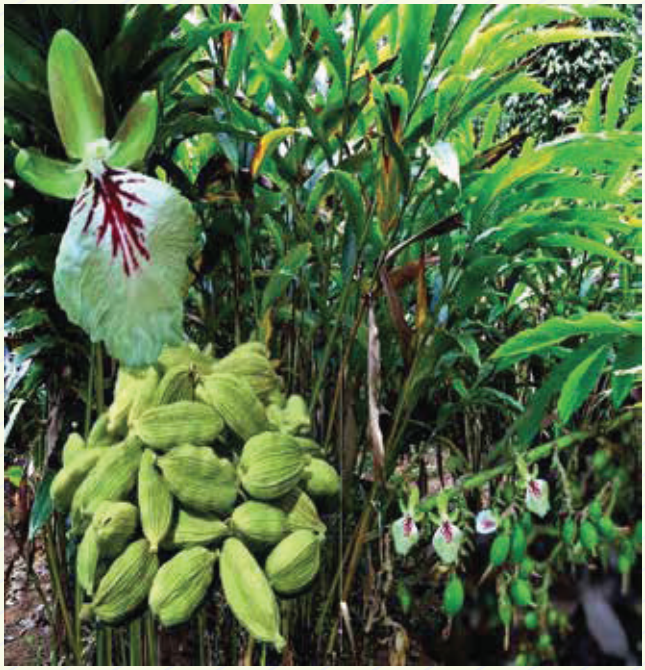
এছাড়াও চারা রোপণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে একই হারে ইউরিয়া- পটাশ সার দিতে হবে।

গাছের পরিচর্যা

চারা রোপণের ৩ বছর পর শীতকালে এলাচ সংগ্রহের পর পুরাতন গাছ ছাটাই করতে হবে। অবাঞ্ছিত মরা গাছ, পাতা ছাটাই না করলে ভালো ফলন হয় না।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বাংলায় আষাঢ় মাসে এলাচের এই জাতগুলোর ফুল আসে এবং ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের শেষের দিকে এলাচ হয়। তখন বাগান থেকে কাঁচা এলাচ সংগ্রহ করে রোদে শুকাতে হয় অথবা বেশি পরিমাণে উৎপাদন করলে ড্রায়ার মেশিনের সাহায্যে শুকাতে হয়। বর্ষাকালে হয়ে থাকে বলে এলাচ না শুকিয়ে ঘরে রাখলে পচন ধরার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এলাচ ফল পরিপক্ব হলে ফলগুলো দেখতে কিছুটা সবুজের উপর লালচে হবে।



ফলন

প্রায় প্রতি ঝোপ থেকে ৮০০ থেকে ৯০০ গ্রাম এমনকি ১ কেজির উপরে ফলন পাওয়া যাবে। ৩ বছর পরে ১ বিঘা বা ৩৩ শতক জমি থেকে ৯০০ থেকে ১০০০ কেজি বা ১ টন ফলন পাওয়া যাবে। সেই হিসাবে ১ বিঘা জমি থাকে বছরে ১০ লক্ষ টাকার এলাচ উৎপাদন করা সম্ভব।

ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কৌশল

ফসল কাটার পরে, ক্যাপসুলগুলি বৈদ্যুতিক ড্রাইয়ারে বা রোদে শুকানো হয়। সবুজ এলাচের ক্যাপসুলগুলি ২% ওয়াশিং সোডায় শুকানোর আগে ১০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখলে শুকানোর সময় সবুজ রং ধরে রাখতে সাহায্য করে। যখন ড্রাইয়ার ব্যবহার করা হয়, তখন এটি ১৪ থেকে ১৮ ঘন্টার জন্য ৪৫ থেকে ১০৫^{o}C তাপমাত্রায় শুকানো উচিত। শুকানোর জন্য রাখা ক্যাপসুলটি পাতলাভাবেছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সমানভাবে শুকানোর জন্য বার বার নাড়তে হয়। শুকনো ক্যাপসুলগুলিকে হাত বা নারিকেলের ছোবড়া বা তারের জাল দিয়ে ঘষে বাইরের ময়লা পদার্থ অপসারণের জন্য ঝাঁকানো হয়। তারপর সেগুলি আকার এবং রং অনুসারে বাছাই করা হয় এবং স্টোরেজের সময় সবুজ রং ধরে রাখার জন্যকালো পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করা হয়। এসব ব্যাগ পরে কাঠের ঘরে রাখা হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা:

লোমশ শুঁয়োপোকা (Hairy caterpillar): Phosalone ৩৫ EC ১ মিলি/লিটার স্প্রে করে লোমশ শুঁয়োপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অঙ্কুর এবং ফল ছিদ্রকারী: স্ত্রী পতঙ্গকে আকৃষ্ট ও ধ্বংস করার জন্য ফেরোমন ফাঁদ @ ১২ Nos./hectare স্থাপন করা যায়।

মাইটস: ডাইকোফল ১৮.৫ ইসি ২ মিলি/লিটার স্প্রে করে মাইট নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নেমাটোড মিথাইল ব্রোমাইড (@ ৫০০ গ্রাম/১০ বর্গমিটার) বা ইথিলিন-ডাই-ব্রোমাইড (২০ লিটার/হেক্টর) বা ডুরোফিউম (৩০ লিটার/হেক্টর) ব্যবহার করে নার্সারি বেডগুলিকে ২-৩ দিনের জন্য পলিথিনে ঢেকে রাখতে হবে অথবা ২% ফরমালিন দিয়ে নার্সারি বেড ভিজিয়ে রাখতে হবে। কার্বোফুরান ৩ জি ৫ কেজি a.i/ha প্রয়োগ করা যায়।

মোজাইক বা কাণ্ডে রোগ

এটি একটি গুরুতর রোগ যা এলাচের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে। এটি কলার এফিড দ্বারা সংক্রামিত হয় যা নিয়মিত মিথাইল ডেমেটন ২৫ ইসি বা ডাইমেথোয়েট ৩০ ইসি বা ফসফোমিডন ৮৬ ডব্লিউএসসি ৭৫০ মিলি/হেক্টর হারে স্প্রে করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ড্যাম্পিং অফ বা ক্লাম্প রট বা রাইজোম পচা: বপনের আগে ৫০ লিটার পানিতে ১ লিটার ফরমালডিহাইড দিয়ে ৩ বর্গমিটারের জন্য নার্সারি ভিজিয়ে নিন। Pythium নিয়ন্ত্রণের জন্য অঙ্কুরোদগমের পরপরই ০.২৫% ম্যানকোজেব বা ১% বোর্ডো মিশ্রণ এবং ১৫ দিন পর রাইজোক্টোনিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ০.০৫% কার্বেন্ডাজিম দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়।

১৩. লেমনগ্রাসের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: লেমন গ্রাস
ইংরেজি নাম: Lemon grass
বৈজ্ঞানিক নাম: Cymbopogon Citratus

ভূমিকা

লেমন গ্রাস বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। গাছ অনেকটা ধান গাছের মতো তবে পাতা তুলনামুলকভাবে চওড়া। পাতা লম্বাকৃতি, চিকন ও অগ্রভাগ সূচালো। এটি লেবুর মতো গন্ধযুক্ত। পাতা লম্বায় প্রায় ১২ ইঞ্চি, খসখসে ও প্রান্তভাগ ধারালো । অনেক দেশে তেলের জন্য এর চাষ হয়। বছরে বেশ কয়েকবার পাতা তোলা যায় এবং গাছ তিন-চার বছর একাধারে ভাল পাতা সরবরাহ করতে পারে। লেমন তেল হতে সাইট্রাল নিষ্কাশন করে সুগন্ধি ও ভিটামিন সংশ্লেষণ করা হয়। এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চল এর আদি নিবাস ।

ঔষধিগুণ

ব্যথা এবং ফোলা উপশম করে, জ্বর কমায়, রক্তে চিনি এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করে, জরায়ু এবং মাসিক প্রবাহকে উদ্দীপিত করে এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। লেমন গ্রাসে থাকে থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, নিয়াসিন পান্টোথেনিক অ্যাসিড, ভিটামিন, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, সোডিয়াম, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি। লেমন গ্রাসের চা বেশ জনপ্রিয় পানীয়। উচ্চ রক্তচাপ, ঠান্ডা, কাশি, হজমে সহায়তা, ওজন নিয়ন্ত্রণ, ত্বক ও চুলের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এর ভূমিকা রয়েছে। লেবুগন্ধি ঘাস ফুলের ঘ্রাণ স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে ও মস্তিস্ক পরিষ্কার করে। লেমন তেল হতে সাইট্রাল নিষ্কাসন করে সুগন্ধি ও ভিটামিন এ সংশ্লেষণ করা চলে। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যকে সুগন্ধি করার জন্য লেমনগ্রাস ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রসাধানীতে প্রাকৃতিক সুগন্ধি হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।

পুষ্টিগুণ

লেমনগ্রাস (সিট্রোনেলা) কাঁচা ১ টেবিল চামচে-প্রোটিন ০.০৯ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ১.২১ গ্রাম, শক্তি ৪.৭৫ কিলোক্যালরি, ক্যালসিয়াম ৩.১২ মিলি গ্রাম, আয়রন ০.৩৯ মিলি গ্রাম।

জন্মস্থান/উৎস

এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চল এর আদি উৎস। পশ্চিম ভারতীয় লেমনগ্রাস (Cymbopogon citratus) সামুদ্রিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয়।

জাত

ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান লেমনগ্রাস (Cymbopogon citratus) এবং ইস্ট ইন্ডিয়ান লেমনগ্রাস (Cymbopogon flexuosus)

জলবায়ু ও মাটি

আমাদের দেশে প্রায় সবধরণের মাটিতেই লেবু ঘাস জন্মে। বেলে বা দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়। সমতল বা পাহাড়ের ঢালের যেকোন জমিতে এই ফসলের চাষ করা যায়। এমনকি গাছটিকে খুব সহজেই ছাদ বাগান বা বারান্দায় টবে চাষ করা যায়। এর জন্য আলগা ঝুরঝুরে গার্ডেন সয়েল ৫০%, মোটা বালি ২০%, কোকোপিট ২০%, ভার্মি কম্পোস্ট ১০%, অল্প পরিমাণ হাড়ের গুড়া, শিং কুচি একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। কোকোপিট পানি ধরে রাখতে সক্ষম। হঠাৎ পানিদিতে ভুলে গেলে এরা মাটিকে আর্দ্র রাখবে। ১০-১২ ইঞ্চি টব নির্বাচন করতে হবে ও ভালোভাবে এর ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরি করতে হবে। লেমন গ্রাসের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

চারা রোপন ও সার ব্যবস্থাপনা

বীজ ও মোথা দিয়ে লেবু ঘাসের চাষ করা যায়। লেবু ঘাসের বীজ বোনার উপযুক্ত সময় হল জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ মাসের মাঝামঝি পর্যন্ত। এসময় বীজ বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। লেবু ঘাসের বীজ ছিটিয়ে বোনার চাইতে ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার দূরে সারি করে বপন করা ভাল। বীজ থেকে চারা গজানোর পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে। তবে সাধারণত মোথাবা মাটির নিচের অংশের মাধ্যমে এর বংশ বৃদ্ধি করে, তাই মাটির উপরের অংশ কেটে ফেলে দিয়ে চাষকরা যায়। মার্চ-এপ্রিল গাছ যখন অনেক দুর্বল এবং হলুদ হয়ে আসে তখন গাছ কেটে শেকড় এক দেড় ফুট দুরত্বে অন্যত্র লাগানো হয়। জমিতে লেবু ঘাসের চাষ করার ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরি করার সময় প্রতি হেক্টরে ৫ থেকে ১০ টন গোবর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা ও আগাছা দমন

বীজ গজানোর পর জমিতে যদি রস না থাকে তবে অবশ্যই সঠিক পরিমাণে সেচ দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়ায় পানি জমে যেন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়। তাহলে গাছের গোঁড়াপচে যেতে পারে। তাই যদি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তাহলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। লেবুঘাসের ক্ষেত সবসময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যদি ক্ষেতে কখনও আগাছা জন্মায় তবে তা অবশ্যই পরিস্কার করতে হবে।

পরিপক্ক হওয়ার বয়স

লেবু ঘাসের বীজ বপন করার ২১ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে লেবু ঘাসের বীজ গজায়। সময়মত বীজ বুনলে বা মোথা লাগালে বীজ বপন বা চারা লাগানোড় ৩ থেকে ৪ মাস পর থেকেই অল্প অল্প করে পাতা তোলা শুরুকরা যায়। ৮ থেকে ৯ মাসে পরিপক্ব হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ সম্পূর্ণ গাছ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ/সংরক্ষণ

কাঁচা অবস্থায় সম্পূর্ণ গাছ বিশেষকরে লেমনগ্রাসের পাতা ব্যবহৃত হয়।

কীটপতঙ্গ ও রোগ ব্যবস্থাপনা

কান্ড ছিদ্র কারি পোকাঃ এটি কান্ড খায়। কেন্দ্রীয় পাতা শুকিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পুরো অঙ্কুরই মারা যায়, যার ফলে ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

প্রতিকারঃ Folidol E ৬০৫ এর প্রয়োগ করতে হবে।

১৪. ভ্যানিলার চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: ভ্যানিলা
ইংরেজি নাম: Vanilla
বৈজ্ঞানিক নাম: Vanilla planifolia

ভূমিকা

ভ্যানিলা মূলত একটি অর্কিড জাতীয় লতানো উদ্ভিদ যা অন্য একটি গাছকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। ভ্যানিলার গাছটি দেখতে গাঢ় সবুজ বর্ণের হলেও ফুলটির রঙ সাধারণত হলুদ রঙের। স্বল্পস্থায়ী এ ফুলটির পরাগায়ন হলে সেখান থেকে চ্যাপ্টা বরবটির মতো এক ধরনের ফল হয় যাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। এ ফল ও বীজে যে অ্যাসেনসিয়াল অয়েল থাকে তা থেকেই তৈরি হয় ভ্যানিলা ফ্লেভার। এ ফ্লেভার শুধু খাবারেই নয়, কসমেটিকস ও পারফিউমেও ব্যবহার হয়ে আসছে। ভ্যানিলা বিশ্বের দ্বিতীয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল মসলা হওয়ায় এর চাষ কৃষকদের জন্য একটি লাভজনক চুক্তি হতে পারে ।

ঔষধিগুণ

ভ্যানিলিন হল একটি ফেনোলিক উদ্ভিদ যৌগ যা ভ্যানিলা নির্যাসে পাওয়া যায়। ভ্যানিলিনে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ভ্যানিলিনের ক্যান্সার প্রতিরোধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পুষ্টিগুণ

ভ্যানিলা নির্যাস (১ চা চামচ): প্রোটিন ০ গ্রাম, শক্তি ১২.১ কিলোক্যালরি, চিনি ০.৫৩ গ্রাম, ও ক্যালসিয়াম ০.৪৬ মি. গ্রাম।

জন্মস্থান/উৎস

এর আদি উৎস মেক্সিকো বলে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া প্রায় ৫৮ শতাংশ ভ্যানিলা উৎপাদন ও রফতানি করে।

জাত

বোরবন ভ্যানিলা বা বোরবন-মাদাগাস্কার ভ্যানিলা, (Bourbon vanilla or Bourbon-Madagascar vanilla)- আমেরিকা থেকে প্রবর্তিত V. planifolia উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন, মাদাগাস্কার, কোমোরোস, মরিশাস এবং রিইউনিয়নের মতো ভারত মহাসাগরের দ্বীপ থেকে, যার পূর্বে নাম ছিল ইলে বোরবন। এটি ভারতের মতো গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলিতে সফলভাবে জন্মানো V. planifolia থেকে প্রাপ্ত স্বতন্ত্র ভ্যানিলার স্বাদ বর্ণনা করতেও ব্যবহৃত হয়।

মেক্সিকান ভ্যানিলা: স্থানীয় V. planifolia থেকে তৈরি, অনেক কম পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং এর উৎপত্তিস্থল থেকে ভ্যানিলা হিসেবে বাজারজাত করা হয়।

তাহিতিয়ান ভ্যানিলা: এটি ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার, V. tahitensis প্রজাতি, জেনেটিক বিশ্লেষণ দেখায় যে এই প্রজাতিটি সম্ভবত V. planifoli-aGes V. odorata এর সংকর থেকে একটি জাত। প্রজাতিটি ফরাসি অ্যাডমিরাল ফ্রাঁসোয়া আলফোনস হ্যামেলিন ফিলিপাইন থেকে ফরাসি পলিনেশিয়ায় প্রবর্তন করেছিলেন। এটি থেকে এক শতাংশেরও কম ভ্যানিলা উৎপাদন হয় এবং এটি শুধুমাত্র কয়েকজন দক্ষ চাষী এবং প্রস্তুতক-ারী দ্বারা জন্মায়।



ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ভ্যানিলা: ক্যারিবিয়ান এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মানো V. pompon থেকে এটি জন্মায়।

মাটি এবং জলবায়ু

এই উদ্ভিদটি অনেক ধরনের মাটিতে চাষ করা যায়। এটি জৈবপদার্থসমৃদ্ধ ঝরঝরে বেলে-দোআঁশ মাটি তার চাষের জন্য ভাল বলে মনে করা হয় । এক্ষেত্রে মাটির পিএইচ (pH) রাখতে হয় ৫.৩ থেকে ৫.৬ এর মধ্যে। জমিতে জলাবদ্ধতার সমস্যা এড়াতে সঠিক নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উত্তম এবং আর্দ্র জলবায়ু ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত। যে জায়গাটিতে ভ্যানিলা চাষ করা হচ্ছে সেখানে যেন কড়া রোদ না থাকে। সবথেকে ভালো হয় কোন ছাউনিওয়ালা ঘর তৈরি করে তারপর সেখানে ভ্যানিলা চাষ করা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ভাল ফসল পাওয়া যায়।



রোপণ পদ্ধতি

ভ্যানিলা উদ্ভিদ কাটিং এবং বীজ উভয় মাধ্যমে রোপণ করা যেতে পারে। এর দানা আকারে ছোট, তাই চাষের জন্য বীজ কম ব্যবহার করা হয়। মূলত কাটিং পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। এর কাটিং রোপণের জন্য, আগাম ক্ষেতে একটি গর্ত প্রস্তুত রাখতে হবে এবং এতে গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট মেশান। এর পরে, প্রায় ৪ ফুট দূরত্বে কাটিং রোপণ করতে হবে।

সার এবং সেচ ব্যবস্থাপনা

এক একটি ভ্যানিলা গাছ ফলন দেওয়ার জন্য তিন বছর সময় নেয়। তবে এই গাছে ফল আসতে শুরু করলে ক্রমশ ফলন বাড়াতে থাকে। সার এবং সারের পরিমাণ মাটিতে উপস্থিত পুষ্টির উপর নির্ভর করে। সাধারণত প্রতি উদ্ভিদে ৪০ থেকে ৬০ গ্রাম নাইট্রোজেন, ২০ থেকে ৩০ গ্রাম ফসফরাস এবং ৬০ থেকে ১০০ গ্রাম পটাশ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া গোবর সার বা ভার্মি কম্পোস্টও জমিতে যোগ করা যেতে পারে। এটি মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি পূরণ করবে। মাটির আর্দ্রতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়।

পরাগায়ন এবং ফসল কাটা

ভ্যানিলা চারা রোপণের তিন থেকে চার বছর পর ফুল আসতে শুরু করে। একেকটি থোকায় ১৫-২০ টি ফুল থাকে। প্রতিটি ফুল থেকে একটি করে পড হয়। ভ্যানিলা উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা এর ফুলের বৈচিত্র্যময় গঠন যা স্বাভাবিক পরাগায়নে বাধা দেয়। সাধারণত প্রাকৃতিক পরাগায়নের উৎপাদন খুবই কম হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে কৃত্রিম পরাগায়ন করা হয়ে থাকে। ভ্যানিলা ফুলের পরাগধানী ও গর্ভমুন্ডের মাঝে ঠোঁটসদৃশ একটি পর্দা (রোস্টেলাম) থাকায় পরাগরেণু গর্ভমুন্ডে পতিত হতে পারে না। পর্দাটি নিডল দিয়ে সরিয়ে সামান্য চাপ দিলেই পরাগায়ন সম্পন্ন করা যায়। একজন দক্ষ শ্রমিক দিনে এক হাজার থেকে দেড় হাজার ফুল পরাগায়ন করতে পারে। পরাগায়ন থেকে পড পরিপক্ব হতে ৬ থেকে ৯ মাস সময় লেগে থাকে। যখন পডগুলি হালকা হলুদ রঙের হয়ে যায়, তখন এটি কাটা উচিত। পডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ থেকে ২৫ সেমি। পড পরিপক্ক হওয়ার শেষের দিকে এতে গ্লুকোজ ও ভ্যালিন উৎপাদিত হয়, যা ফারমেন্টেশনের সময় গ্লুকোজও ভ্যানিলিনে পরিণত হয় যা থেকেই তৈরি হয় এর মোহনীয় নির্যাস।

কীটপতঙ্গ ও রোগ ব্যবস্থাপনা

ভ্যানিলা অনেক ছত্রাক এবং ভাইরাল রোগের জন্য সংবেদনশীল। ফুসারিয়াম, (Fusarium) স্ক্লেরোটিয়াম (Sclerotium), ফাইটোফথোরা (Phytophthora) এবং কোলেট্রোট্রিকাম (Colletrotrichum) প্রজাতির মূল, কান্ড, পাতা, মটরশুটি এবং অঙ্কুর শীর্ষে পচনের জন্য দায়ী। Bordeaux mixture (১%), কার্বেন্ডাজিম (০.২%) এবং কপার অক্সিক্লোরাইড (০.২%) স্প্রে করে ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই ধরনের রোগের বিস্তারের জৈব বালাই ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মাটিতে ট্রাইকোডার্মা (রাইজোস্ফিয়ারে প্রতি গাছে ০.৫ কেজি (১.১ পাউন্ড) এবং সিউডোমোনাস (০.২%) ফলিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

মোজাইক ভাইরাস, লিফ কার্ল এবং সিম্বিডিয়াম মোজাইক পোটেক্সভাইরাস সাধারণ ভাইরাল রোগ। এই রোগগুলি রসের মাধ্যমে ছড়ায়, তাই আক্রান্ত গাছগুলি অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে।

ভ্যানিলার কীটপতঙ্গের মধ্যে রয়েছে বীটল এবং উইয়িভিল যারা ফুলকে আক্রমণ করে, শুঁয়োপোকা, সাপ এবং স্লাগ যা অঙ্কুরের কোমল অংশ, ফুলের কুঁড়ি এবং অপরিপক্ব ফলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং ফড়িং যেগুলি অঙ্কুরের ডগা কাটে। জৈব কৃষি অনুশীলন করে, এবং কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কীটনাশক এড়ানো যায়।



১৫. আলুবোখারা চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: আলুবোখারা
ইংরেজি নাম: Plum
বৈজ্ঞানিক নাম: *Prunus domestica*

ভূমিকা

আলুবোখারা বা প্লাম রোজেসি (Rosaceae) পরিবারভুক্ত বাংলাদেশের স্বল্প ব্যবহৃত একটি উচ্চ মূল্যের ফল জাতীয় মসলা ফসল। এটি পিচ, চেরী ও বার্ত চেরী এর সমগোত্রীয়ফল প্রধানত মসলা হিসাবে ও আচার বা চাটনীতে ব্যবহার করা হয়। শুকনা আলুবোখারা (যা প্রুননামে পরিচিত) মিষ্টি, রসালো এবং এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। পাকা ফল ডিপ ফ্রীজে সারা বছর রেখে তা থেকে সরবত বা চাটনি তৈরি করে খাওয়া যায়।

ঔষধিগুণ

আলু বুখারা হল পটাসিয়ামের একটি সমৃদ্ধ উৎস যা কোষ এবং শরীরের তরলগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। এটি প্লেটলেটজমাট বাঁধতে বাধা দেয় যার ফলে এথেরোস্ক্লেরোসিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক এবং করোনারি হৃদরোগহতে বাধা দেয়।

পুষ্টিগুণ

আলু বোখারা পুষ্টি উপাদান রয়েছে শক্তি ৪৬ কিলোক্যালরি, প্রোটিন ০.৭ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ১১.৪ গ্রাম এবং চর্বি ০.২৮ গ্রাম

জাত

বারি আলুবোখারা-১: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বারি আলুবোখারা-১ জাতটি ২০১৩-১৪ সালে অনুমোদন করা হয়। এর গাছ মাঝারি আকারের, ৫-৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে শাখা ছাটাই না করলে এর গাছ ১২মিটার লম্বা ও ১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। ফেব্রুয়ারি মাসে এ জাতটিতে ফুল আসে আর জুন মাসে ফল পাকে। আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল রঙের মাঝারী আকারের (৮.৬৬ গ্রাম/ফল) সুগন্ধিযুক্ত ফল। এর ফলের খাদ্যাংশ বেশি (৯৭%) এবং মাঝারী টক মিষ্টি স্বাদের (টিএসএস ১১.০)। গাছে প্রচুর ফল ধরে (গড়ে ১,৪০০টি), ১১.৩ কেজি বা হেক্টরপ্রতি ৭.০৩ টন। এ জাতটিতে রোগবালাই এর আক্রমণ অনেক কম।

জন্মস্থান/উৎস

আলুবোখারা হল একটি বরই জাতের শুকনো রূপ যা এশিয়ায় উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করা হয় এবং তারপর থেকে, এগুলি সারা বিশ্বে প্রধানত ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ভারতএবং বাংলাদেশে চাষ করা হচ্ছে।



আবহাওয়া ও মাটি

সাধারণত শীত প্রধান ও অবউষ্ণ আবহাওয়া আলুবোখারা চাষের জন্য উপযোগী। তার ০-৭.২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলুবোখারা রৌদ্র উজ্জ্বল আবহাওয়া ও সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী পর্যাপ্ত সূর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে আলুবোখারা চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলুবোখারা চারা রোপণ করা যায়।

রোপণদূরত্ব

সারি থেকে সারি ৪-৫ মিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩-৪ মিটার।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে উৎপাদিত চারা বা কলমের মাধ্যমে আলুবোখারার বংশ বিস্তার করাযেতে পারে। মাতৃ গাছের গুণগত মান বজায় রাখা ও দ্রুত ফলন পাওয়া যায় বলে কলমের চারাই উত্তম। ২,০০০-৪,০০০ পিপিএম মাত্রার ইনডোল বিউটেরিক এসিড (আইবিএ) প্রয়োগে গুটি কলম এর সাফল্য বাড়ে। মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা কলম পাতা ও শাখা ছাটাই করে পলিব্যাগে ২/১ মাস রেখে ভালভাবে শিকড় ও পাতা গজানোর পরে জমিতে লাগানো যেতে পারে। বীজ থেকে উৎপাদিত চারার উপর ক্লেফ্‌ট বা ভিনিয়ার কলম করে সহজেই কলমের চারা উৎপাদন করা যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৪-৫ মিটার দূরের সারিতে ৪ মিটার দূরে দূরে ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করে উপরের মাটি একপাশে ও নিচের মাটি অন্যপাশে রাখতে হবে। প্রতি গর্তে পচা গোবর অথবা কম্পোস্ট ১০-১৫ কেজি, ৩-৫ কেজি ছাই, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম, জিপসাম ১৫০ গ্রাম, দস্তা ১০ গ্রাম ও বোরন ১ গ্রাম পরিমাণে ভালভাবে উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে উপরের মাটি নিচে আর নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

ভাল উৎপাদন ও আগাম ফলন পেতে আলুবোখারার এক বছরবয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শুকনা মৌসুমে গাছে নিয়মিত সেচ ও আগাছা হলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে আলুবোখারা নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছে সার প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০-৮০০	১০০০
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০
এম ও পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০

সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকানো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

বারি আলুবোখারা-১ এ কোন পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়নি। শুধুমাত্র পাতার দাগ বা লিফ স্পট রোগ দেখা গেছে। ম্যানকোজেব বা এ জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করেই তা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

আলুবোখারার ফল নন-ক্লাইমেক্টরিক হওয়ায় গাছ থেকেই ভালভাবে পাকার পর তা সংগ্রহ করতে হয়। আলুবোখারার ফল ভালভাবে পেকে গাঢ় লাল বা হালকা খয়েরী রং ধারণ করলে এবং ফল নরম হলেই সংগ্রহ করা উচিৎ। হালকা লাল বা হলুদ আবস্থায় সংগ্রহ করা হলে তা অত্যন্ত টক বা হালকা তেতো স্বাদেরও হতে পারে। বারি আলুবোখারা -১ এর বা এ জাতের প্রতি পূর্ণবয়স্ক (১০-২০ বছর) গাছে দেড় থেকে তিন হাজার পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। হেক্টরপ্রতি ৭ থেকে ১০ টন ফ্রেশ পাকা ফল পাওয়া যেতে পারে। যা থেকে হেক্টরপ্রতি ২৮-৪০ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব।

১৬. চুই ঝালের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: চুই ঝাল
ইংরেজি নাম: *Piper chilli*
বৈজ্ঞানিক নাম: Piper chaba

ভূমিকা

চুই ঝাল, বা চই ঝাল (বৈজ্ঞানিক নাম: Piper chaba) হচ্ছে পিপারাসি পরিবারের সপুষ্পক লতা। পান ও চুই ঝাল একই পরিবারের। চুই ঝাল গাছ দেখতে পানের লতার মতো। পাতা কিছুটা লম্বা ও পুরু। পাতায় ঝাল নেই। এর কান্ড বা লতা কেটে ছোট টুকরো করে মাছ-মাংস রান্নায় ব্যবহার করা হয়। রান্নার পর এই টুকরো চুষে বা চিবিয়ে খাওয়া হয়। ঝাল স্বাদের হলেও চুইয়ের নিজস্ব স্বাদ ও ঘ্রাণ আছে।

ঔষধিগুণ

গ্যাস্ট্রিক সমস্যার সমাধান করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।খাবারের রুচি বাড়াতে এবং ক্ষুধামান্দা দূর করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ সারাতে চুইঝাল অনেক উপকারী; স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও মানসিক অস্থিরতা প্রশমন করে; ঘুমের ওষুধ হিসেবে কাজ করে এবং শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে এবং শরীরের ব্যথা সারায়;সদ্য প্রসূতি মায়েদের শরীরের ব্যথা দ্রুত কমাতে ম্যাজিকের মতো সাহায্য করে; কাশি, কফ, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া ও রক্তস্বল্পতা দূর করে; এক ইঞ্চি পরিমাণ চুই লতার সাথে আদা পিষে খেলে সর্দি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

পুষ্টিগুণ

চুইঝালে দশমিক ৭ শতাংশ সুগন্ধি তেল, ৫ শতাংশ অ্যালকালয়েড ও পিপালারটিন আছে ৫ শতাংশ ও ৪ থেকে ৫ শতাংশ পোপিরন থাকে। এছাড়া পোলার্টিন, গ্লাইকোসাইডস, মিউসিলেজ, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সিজামিন, পিপলাসটেরল থাকে। এর কান্ড, শিকড়, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি ভেষজগুণ সম্পন্ন। শিকড়ে থাকে দশমিক ১৩ থেকে দশমিক ১৫ শতাংশ পিপারিন।

জন্মস্থান/উৎস

চুই ঝাল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় প্রজাতি। এটি গোটা ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য উষ্ণ এলাকাসহ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর ও শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে জন্মে।

জলবায়ু

এটি আসাম এবং মেঘালয়ের উচ্চ বৃষ্টিপাতের এলাকায় কোন সম্পূরক সেচ ছাড়াই চাষ করা হয় এবং অন্যান্য অংশে সেচ ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। যেহেতু এটি একটি অগভীর শিকড়যুক্ত ফসল এটির জন্য উচ্চ আর্দ্রতা এবং ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। ভালো বৃদ্ধির জন্য গাছটি আংশিক ছায়ায় জন্মাতে হবে। এইভাবে, এটি সেচযুক্ত নারকেল এবং অ্যারেকা বাদাম বাগানে আন্তঃফসল হিসাবে সফলভাবে চাষ করা যেতে পারে। এটি খরা এবং জলাবদ্ধতার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল।

মাটি

বিভিন্ন ধরনের মাটিতে ফসল ভালোভাবে জন্মায়। জৈব উপাদান সমৃদ্ধ হালকা ছিদ্রযুক্ত সুনিষ্কাশিত মাটি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। জৈব পদার্থ (হিউমাস) সমৃদ্ধ ভাল নিষ্কাশন করা লাল, দোআঁশ মাটি চাষের জন্য উপযুক্ত। উচ্চ আর্দ্রতা সহ নিম্ন উচ্চতা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এটি ৩০-৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা, ৬০% আর্দ্রতা সহ বার্ষিক ১৫০ সেমি বৃষ্টিপাত সহ অঞ্চলগুলিতে ভালভাবে বিকাশ লাভ করে।

চারা রোপণ

এপ্রিল থেকে জুলাই এ সময় লতা ও চারা সংগ্রহ করা হয়। একটি হালকা সেচ প্রতিস্থাপনের ঠিক পরে দেওয়া হয় মাটির আর্দ্রতা এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য।

সার প্রয়োগ

২০-২৫ টন/হেক্টর (সমভূমির জন্য) এবং ১০ টন/হেক্টর (পাহাড়ের জন্য) ফার্ম ইয়ার্ড সার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সেচ পদ্ধতি

সাপ্তাহিক বিরতিতে সেচ দেওয়া যেতে পারে।

গাছের পরিচর্যা

চাষের পর আগাছা পরিষ্কারের পর আর্থিং আপ করতে হয় ৩ মাস পর্যন্ত। শুকনো পাতা মালচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পর্যাপ্ত ছায়া নিশ্চিত করতে প্রতি বছর ছায়াযুক্ত গাছ ছাঁটাই করতে হবে। চুইজালের বাগানে অতিরিক্ত ছায়ার প্রয়োজন হলে কলা রোপণের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে।

ফল সংগ্রহ

ফল গাঢ় সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হলে ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে। ফসল তিন বছর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে।

ফলন

প্রথম বছর - ৭৫০ কেজি শুকনো ফল/হেক্টর
দ্বিতীয় বছর - ১৫০০ কেজি শুকনো ফল/হেক্টর

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

পাতার দাগ-বর্ষাকালে ম্যানকোজেব ২ গ্রাম/লিটার পানিতে স্প্রে করতে হবে।

লেবু জাতীয় ফসলের চাষ পদ্ধতি



১৭. বাতাবিলেবু চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: বাতাবিলেবু
ইংরেজি নাম: Pomelo
বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus maxima*

ভূমিকা
বাতাবিলেবু ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল বাতাবিলেবু বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ফসল। দেশের সব এলাকাতেই এর চাষ হয় তবে সিলেটে বেশি হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বাতাবিলেবুর মোট উৎপাদন প্রায় ৬৫ হাজার মে. টন।

পুষ্টিগুণ
প্রতি ১০০ গ্রাম পুষ্টি উপাদান মান রয়েছে শক্তি ৩৮ কিলোক্যালরি, প্রোটিন ০.৭৬ গ্রাম, চর্বি ০.০৪ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৯.৬২ গ্রাম।

ঔষধিগুণ
জন্ডিসের ক্ষেত্রে এবং ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের উপশমে এই ফল খাওয়া হয়। হাড়ের অসুখ বা অস্টিওপোরোসিস, ত্বকে অকালবার্ধক্যের ছাপ পড়ার মতো শারীরিক সমস্যাকে ঠেকিয়ে রাখে এই লেবু পাতা, ফুল ও ফলের খোসা গরম পানিতে সিদ্ধ করে পান করলে মৃগী, হাতপা কাঁপা ও প্রচন্ড কাশি রোগীর প্রশান্তি আনয়ন করে।

জন্মস্থান/উৎস: এটি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয়।

বাতাবি লেবুর জাত
বারি বাতাবিলেবু-১: বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত বাতাবিলেবুর জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন করে 'বারি বাতাবিলেবু-১' জাতটি ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের পাতা বড় আকৃতির গাঢ় সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে। ফলের আকৃতি প্রায় গোলাকার (টিএসএস ৯.২০%)। ফলের ওজন ৯০০-১,১০০ গ্রাম। ফলের আকার মাঝারী। ফলের কোষ সংখ্যা ১৩-১৪টি। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪৫%। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-২: দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত বাতাবিলেবুর জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি উন্নত জাত 'বারি বাতাবিলেবু-২' ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি ছাতার মতো। পাতা গাঢ় সবুজ, ডানাযুক্ত বৃত্তাকার। টিএসএস ১১.৩৫%। মোট এসিড ১.০৫%। ফলের ওজন ৭৫০-৭৮০ গ্রাম। ফলের আকার ১১.০০ × ১২.৩০ সেমি। ফলের কোষ সংখ্যা ১৩-১৫টি, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪০% এবং খোসার পুরুত্ব ১.২-১.৪ সেমি। বীজের সংখ্যা ১১০-১২০টি। ফল সুস্বাদু, বেশ রসালো, শাঁসের রং লালচে এবং বেশ মিষ্টি। শাঁস নরম এবং পাকা ফলের রং হলুদ। হেক্টর প্রতি ফলন ১২-১৪ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।



বারি বাতাবিলেবু-৩: অভ্যন্তরীণ জরিপের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত জাত বারি 'বাতাবিলেবু-৩' ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। গাছের আকার মাঝারী, পাতা গাঢ় সবুজ ও হৃদপিণ্ডাকার ডানাযুক্ত। প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। হেক্টর প্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-৪: দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি 'বারি বাতাবিলেবু-৪' নামে ২০০৪ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। গাছের আকৃতি ছাতার মতো। পাতা গাঢ় সবুজ, ডানাযুক্ত বৃত্তাকার। গাছে নিয়মিত ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-৫: নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছটির পাতা তুলনামূলকভাবে অনেক বড় ও ঝোপালো। ফলের গোলাকার ও বড় (ফলের গড় ওজন ৮৭৫ গ্রাম)। ফল দেখতে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের এবং টিএসএস ৯.০৫%। সাধারণত লম্বাটে এবং বোটার দিকে সরু।

মাটি

সুনিষ্কাশিত গভীর, হালকা, দোআঁশ মাটি লেবু চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্লীয় মাটিতে বাতাবি লেবু ভাল জন্মে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ফল সাধারণত একক ভাবে ধরে। ফলের অভ্যন্তরে ১৩-১৪টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬৬.২৬%। আট বছর বয়সী প্রতিটি গাছে গড় ফলের সংখ্যা ১৮টি এবং ফলন ১৬.০৪ কেজি এবং ১০.০৩ টন/হেক্টর/বছর। জমি নির্বাচনের পর জমি চাষ দিয়ে আগাছামুক্ত করে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করা প্রয়োজন।

কলম তৈরি ও নির্বাচন

পার্শ্বকলম ও গুটি কলমের মাধ্যমে বাতাবি লেবুর কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত ৮-১০ মাস বয়সের বাতাবি লেবুর চারা বাডিং ও গ্রাফটিংয়ের জন্য আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রোপণের জন্য সোজা ও দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন কলম নির্বাচন করতে হবে।

রোপণের সময়

মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় কলম রোপণ না করাই ভাল। সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছরই বাতাবিলেবুর চারা/কলম রোপণ করা চলে।

গর্ত তৈরি

কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ × ৬ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৫০ সেমি আকারের গর্ত করে কয়েকদিন উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে হয়। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০-৩০০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

কলম রোপণ

গর্তে সার প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর গোড়ার মাটিসহ নির্ধারিত কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করা হয়। রোপণের পর হালকা পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

বয়সভেদে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলোঃ

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	৭-১০	১০-১৫	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৭৫-২২৫	২৭০-৩০০	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০
টিএসপি (গ্রাম)	৮০-৯০	১৪০-১৭০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৪০-১৬০	৪০০-৫০০	৫০০-৫৫০	৬০০-৬৮০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যত দূর পর্যন্ত ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকায় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। উল্লিখিত সার ৩ কিস্তিতে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) ও মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ

ফুল আসা ও ফল ধরার সময় পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়া ও সূর্য পোড়া দাগ দেখা যায়। তাই শুষ্ক মৌসুমে ২১ দিন পর পর ২-৩টি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই

নতুন রোপণকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে ১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর মরা, পোকা-মাকড় ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করতে হয়। ডাল ছাঁটাইয়ের পর কর্তিত স্থানে অবশ্যই বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।





রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

গ্রিনিং: কমলা, মাল্টা ও লেবু জাতীয় গাছের গ্রিনিং একটি মারাত্মক ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ। সাধারণত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা দস্তার অভাবজনিত লক্ষণের ন্যায় হলদে ভাব ধারণ করে। পাতার শিরা দুর্বল হওয়া, পাতা কিছুটা কোঁকড়ানো ও পাতার সংখ্যা কমে আসা, গাছ ওপর থেকে নিচের দিকে মরতে থাকা ও ফলের সংখ্যা কমে যাওয়া হলো এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ রোগ সাইলিডবাগ নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা সংক্রমিত হয়। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ডাল নিয়ে জোড় কলম, শাখা কলম বা গুটি কলম করলে নতুন গাছেও এ রোগ দেখা দেয়।



প্রতিকার: মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রয়োগ করে এরোগ বিস্তারকারী সাইলিডবাগ দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাগানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাছকে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে।

ড্যাম্পিং অফ: লেবুজাতীয় ফলের নার্সারির জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ গজানোর পূর্বে বা পরে উভয় সময়েই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে চারা গোড়ার দিকে পচে যায় এবং চারা মরে যায়। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

প্রতিকার: বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবে না এবং দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলায় ঘন করে চারা লাগানো যাবে না।

ফল ফাটা: তাজা ফল চাষীদের জন্য এটি একটি গুরুতর সমস্যা। কচি ফল বোরনের অভাবের কারণে হতে পারে যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ফলের জন্য, আর্দ্রতার ভারসাম্যহীনতার কারণে ফল ফাটল কারণ এই ফল মাটির আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য খুবই সংবেদনশীল। দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে খোসা শক্ত হয়ে যায় এবং এর পরে যদি ভারী সেচ বা বৃষ্টিপাত হয় তবে চামড়ায় ফাটল হয় ।

ফল সংগ্রহ

ফল কিছুটা হলদে বর্ণ ধারণ করলে মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর) ফল সংগ্রহ করা যায়। বাতাবিলেবু পাকার পরও দীর্ঘ দিন গাছে সংরক্ষণ (Tree storage) করা যায়।

১৮. সিডলেস লেবু চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: সিডলেস লেবু
ইংরেজি নাম: Seedless Lemon
বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus × limon*

ভূমিকা

সিডলেস লেবু হল ছোট চিরহরিৎ গাছের একটি প্রজাতি সারা বিশ্বে রন্ধন সম্পর্কীয় এবং অরন্ধন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, প্রাথমিকভাবে এর রসের জন্য, যদিও সজ্জা এবং ছাল রান্না এবং বেকিংয়েও ব্যবহৃত হয়। লেবুর রস প্রায় ৫% - ৬% সাইট্রিক অ্যাসিড, যা লেবুকে টক স্বাদ দেয়। লেবুর রসের স্বতন্ত্র টক স্বাদ এটিকে পানীয় এবং লেমোনেডের মতো খাবারের একটি মূল উপাদান করে তোলে। বীজহীন লেবুতে রয়েছে ৫২% রস, ফল কোন বীজ ছাড়া হয়,সবুজ হলুদ রঙের ফল। লেবুর একটি জিনোমিক অধ্যয়ন নির্দেশ করে যে এটি তিক্ত কমলা (টক কমলা) এবং সাইট্রনের মধ্যে একটি হাইব্রিড। টিস্যু কালচার থেকে উত্থিত গাছগুলি খুব স্বাস্থ্যকর এবং আরও রোগ প্রতিরোধী।

পুষ্টি উপাদান

ভিটামিন সি এর সমৃদ্ধ উৎস, ১০০ গ্রাম দৈনিক মূল্যের ৬৪% প্রদান করে। পলিফেনল, টারপেনস এবং ট্যানিন সহ অসংখ্য ফাইটোকেমিক্যাল রয়েছে। সাইট্রিক অ্যাসিডের উল্লেখযোগ্য ঘনত্ব (প্রায় ৪৭ গ্রাম/লি. রসে)।

জন্মস্থান/উৎস

লেবুর উৎপত্তি অজানা, যদিও লেবু প্রথম জন্মেছিল আসাম (উত্তরপূর্ব ভারতের একটি অঞ্চল), উত্তর মায়ানমার বা চীনে।

মাটি

লেবু হালকা দোআঁশ ও নিষ্কাশন সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ২.৫ মি. × ২.৫ মি. বা ৩ মি. × ৩ মি. দূরত্বে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ১,১১১ - ১,৬০০টি চারা দরকার হয়।

রোপণ পদ্ধতি

লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে আড়াআড়ি ভাবে লাইন বা সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়।

রোপণ সময়

মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

মাদা তৈরি করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে লাগাতে হবে এবং চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

চারা লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	সারের নাম ও পরিমাণ			
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১৫	২০০	২০০	২০০
৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০
৬ এবং তদুর্ধ্ব	২৫	৫০০	৪০০	৪০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), দ্বিতীয় কিস্তি মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে এবং তৃতীয় কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই

গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া, গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সূর্যালোক পায় না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাঁটাই করে দিতে হবে। মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।



পানি সেচ ও নিষ্কাশন

খরা মৌসুমে ২-৩ বার সেচ প্রয়োগ করা দরকার। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেজন্য নালা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

লেবুর প্রজাপতি পোকা: এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে। এজন্য ফলন ও গাছের বৃদ্ধি ব্যবহত হয়।
প্রতিকার: ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/লিবাসিড ৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কৌশল

ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রং গাঢ় সবুজ হতে কিছুটা হালকা হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে বাছাই এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।



১৯. কমলা চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: কমলা
ইংরেজি নাম: Orange
বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus sinensis*

ভূমিকা

লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে কমলা বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এটি সুমিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪২৭ হেক্টর জমিতে কমলার চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন ৩৩৭২ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড় ও পার্বত্য জেলাসমূহে কমলা ভাল জন্মে।

পুষ্টিগুণ

কমলার ৮৭% পানি, ১২% কার্বোহাইড্রেট, ১% প্রোটিন এবং নগণ্য চর্বি রয়েছে। ১০০ গ্রাম রেফারেন্স পরিমাণ হিসাবে, কমলা ৪৭ ক্যালোরি প্রদান করে, এবং ভিটামিন সি এর একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা দৈনিক মূল্যের ৬৪% প্রদান করে।

জাত

বারি কমলা-১: 'বারি কমলা-১' জাতটি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ১৯৯৬ সালে চাষের জন্য অনুমোদন করা হয়। 'বারি কমলা-১' মাঝারী আকৃতির খাড়া গাছ। পাতা মাঝারী, বল্লাকৃতির। পাতার বোঁটার সাথে ক্ষুদ্র উইং থাকে। এটি একটি নিয়মিত আগাম ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত (গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে)। ফল বড়, ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম ও প্রায় গোলাকৃতির হয়। পাকার পর হলদে রং ধারণ করে। ফলের খোসা ঢিলা, ফল রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলায় চাষোপযোগী।

বারি কমলা-২: বাংলাদেশের ফলের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন। এ কমলা গাছ মধ্যম আকৃতির এবং প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ফল ৭-১২ সেমি আকৃতির প্রায় গোলাকার এবং ফলের গড় ওজন ৩৮ গ্রাম। সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় ফল ও ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খোসা ঢিলা, শাঁস রসালো ও খুব মিষ্টি (টিএসএস ১২%)। বীজ খুব ছোট আকৃতির। এ জাতের কমলা গাছে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি কমলা-৩: নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছটির পাতা তুলনামূলকভাবে বড় ও ঝোপালো। ফল গোলাকার ও বড় (গড় ওজন ১৭০ গ্রাম), দেখতে উজ্জ্বল কমলা বর্ণের। ফল পাকার পর হলুদ থেকে গাঢ় কমলা রং ধারণ করে। ফল সাধারণত এককভাবে ধরে। ফলের খোসা ঢিলা, শাঁস রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১১.৫%)। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১১টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭৯.৮%।

জন্মস্থান/উৎস

কমলার উৎপত্তি দক্ষিণ চীন, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মায়ানমারকে ঘিরে একটি অঞ্চলে এবং মিষ্টি কমলার প্রথম উলেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩১৪ সালে চীনা সাহিত্যে। ১৯৮৭ সালের হিসাবে, কমলা গাছকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি চাষ করা ফল গাছ হিসাবে পাওয়া গেছে।

জমি তৈরি

জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর উভয় দিকে ৪-৫ মিটার দূরত্বে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাটি তুলে পাশে রেখে দিতে হবে। বর্ষার পূর্বে গর্ত মাটি দিয়ে ভর্তি করে রাখতে হবে। কমলা চাষের নির্বাচিত জমি পাহাড়ি হলে সেখানে ৩০-৫০ মিটার দূরত্বে ২-৪টি বড় গাছ রাখা যেতে পারে। তবে বড় গাছ কাটলে শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। তারপর পাহাড়ের ঢাল অনুসারে নকশা তৈরি করে নিতে হবে।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪-৫ মিটার দূরত্বে ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা উৎপাদন

যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই কমলার বংশবিস্তার করা যায়। কমলার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। কমলার বীজ থেকে একাধিক চারা পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি যৌন ও বাকিগুলো অযৌন। তুলনামূলকভাবে সতেজ ও মোটা চারাসমূহ অযৌন চারা বা নিউসেলার চারা হিসেবে পরিচিত। গুটি কলম, চোখ কলম ও জোড় কলম এর মাধ্যমে অযৌন চারা উৎপাদন করা যায়। কমলা উৎপাদনের জন্য রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলমকৃত অযৌন চারা উত্তম।

চারা রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ করতে হবে। চারা কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ (মে-জুন) মাস কমলার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে যে কোন মৌসুমে কমলার চারা লাগানো যায়।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা

সুস্থ সতেজ ১-১.৫ বছর বয়সের চারা/কলম সংগ্রহ করে গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়ার মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোঁড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১০	২০০	১০০	১৫০
৩-৪	১৫	৩০০	১৫০	২০০
৫-১০	২০	৫০০	৪০০	৩০০
১০ এর অধিক	৩০	৬৫০	৫০০	৫০০

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

বয়স্ক গাছে খরা মৌসুমে ২-৩টি সেচ দিলে কমলার ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় সেচ দিলে ফলের আকার বড় ও রসযুক্ত হয়। গাছের গোড়ায় পানি জমলে মাটি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে দিতে হবে।

ডাল পালা ছাঁটাইকরণ

কমলা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

আগাছা দমন

আগাছা কমলা গাছের বেশ ক্ষতি করে। গাছের গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গাছের উপরে পরগাছা ও লতাজাতীয় আগাছা থাকলে তা দূর করতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

লিফ মাইনার পোকা: এটি লেবু জাতীয় ফসলের অন্যতম মারাত্মক শত্রু। সাধারণত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে গাছে নতুন পাতা গজালে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এ পোকার কীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচের সবুজ অংশ খেয়ে আকা-বাঁকা সুড়ঙ্গের মত সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে পাতার কিনারার দিক মুড়ে পুত্তলীতে পরিণত হয়। আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত পাতায় ক্যাঙ্কার রোগ হয়। গাছ দুর্বল হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

প্রতিকার: পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ মিলি এডমায়ার ২০০ এমএল বা ২ মিলি কিনালাক্স২৫ ইসি মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার কচি পাতায় স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা: পূর্ণাঙ্গ পোকা আধা পাকা ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বা কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত স্থানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মে। আক্রান্ত ফল পচে যায় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

প্রতিকার: আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। ফল পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সেঙ্গ ফেরোমন ফাঁদ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা মারা যেতে পারে। আগস্ট মাস থেকে ফল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত বাগানে ১০ মিটার অন্তর এ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

ড্যাম্পিং অফ: লেবুজাতীয় ফলের নার্সারির জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ গজানোর পূর্বে বা পরে উভয় সময়েই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে চারা গোড়ার দিকে পচে যায় এবং চারা মরে যায়। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

প্রতিকার: বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবে না এবং দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলায় ঘন করে চারা লাগানো যাবে না।

গ্রিনিং: কমলা ও মাল্টা জাতীয় গাছের গ্রিনিং একটি মারাত্মক ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ। সাধারণত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা দস্তার অভাবজনিত লক্ষণের ন্যায় হলদে ভাব ধারণ করে। পাতার শিরা দুর্বল হওয়া, পাতা কিছুটা কোঁকড়ানো ও পাতার সংখ্যা কমে আসা, গাছ ওপর থেকে নিচের দিকে মরতে থাকা ও ফলের সংখ্যা কমে যাওয়া হলো এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ রোগ সাইলিডবাগ নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা সংক্রমিত হয়। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ডাল নিয়ে জোড় কলম, শাখা কলম বা গুটি কলম করলে নতুন গাছেও এ রোগ দেখা দেয়।

প্রতিকার: মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রয়োগ করে এ রোগ বিস্তারকারী সাইলিডবাগ দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাগানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাছকে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে।

গামোসিস: ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। রোগাক্রান্ত গাছের কাণ্ড ও ডাল বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বের হতে থাকে। আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ডাল উপর দিক থেকে মরতে থাকে। কাণ্ড বা ডালের সম্পূর্ণ বাকল রিং আকারে নষ্ট হয়ে গাছ মারা যায়। মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। গাছের শিকড় ও গোড়ার বাকল ফেটে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

প্রতিকার: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আদিজোড়/রুট স্টক যেমন- রংপুর লাইম, রাফ লেমন, ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন, কাটা জামির প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা এবং গাছকে সবল ও সতেজ রাখা। মাটি স্যাঁত স্যাঁতে হতে না দেয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সেচ না দেয়া। আক্রান্ত স্থান ছুঁরি দ্বারা চেছে বর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দেয়া (১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন আলাদা পাত্রে গুলিয়ে পরিমিত পানিতে মিশিয়ে বর্দোপেস্ট তৈরি করতে হবে)।

ক্যাঙ্কার: এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। কমলা ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফলের কচি বাড়ন্ত কুঁড়ি, পাতা ও ফলে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। আক্রান্ত পাতার উভয় পাশে খসখসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত অংশের চতুর্দিকে গোলাকার হলুদ কিনারা দেখা যায়। পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে এবং আক্রান্ত ডগা উপর দিক থেকে মরতে থাকে। ফলের উপর আক্রমণ বেশি হলে ফল ফেটে যায় ও ঝরে পড়ে। ঘন ঘন বৃষ্টি হলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত বাতাস জনিত কারণে ও লিফ মাইনার পোকার আক্রমণে গাছের ফল ও পাতায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার ভিতর দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে এ রোগের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার: বৃষ্টির মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বর্দোমিক্সার বা কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হবে এবং সমগ্র বর্ষা মৌসুমে প্রতি মাসে একবার উল্লিখিত ছত্রাকনাশকগুলোর যে কোন একটি স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত ফল ও পাতা কেটে ফেলতে হবে
এবং বাগানে জমে থাকা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। লিফ মাইনার নামক পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে অঞ্চলে বাতাস বেশি হয় সেখানকার বাগানের চারদিকে বাতাস প্রতিরোধক গাছ লাগাতে হবে।

ডাইব্যাক বা আগা মরা রোগ: কমলা গাছের জন্য এটি অত্যন্ত জটিল এবং মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত রোগাক্রান্ত দুর্বল গাছ এবং মাটিতে রস ও খাদ্যোপাদানের স্বল্পতার জন্য এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটিই মরে যায়।

প্রতিকার: পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা যায়। মরা ডাল ২.৫ সেমি সবুজ অংশসহ কেটে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। বছরে ২/১ বার গাছে কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা প্রয়োজন। ফলের খোসা মোটা ও রস কম:জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণে, দস্তা বা ফসফরাসের ঘাটতি হলে এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই ফল সংগ্রহ করা হলে এ সমস্যা হয়।

প্রতিকার: সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম জিঙ্কঅক্সাইড অথবা ৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার পাতায় ও ফলে স্প্রে করতে হবে। অনুমোদিত জাতের চাষ করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা

ফল ভালভাবে পাকার পর অর্থাৎ কমলা বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। গাছ হতে ফল সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলগুলোতে যাতে আঘাত না লাগে। তাজা ফল হিমাগারে সংরক্ষণ করলে ১০০ সে. তাপামাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২ মাস পর্যন্ত এবং ৫.৬০ সে. তাপমাত্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তাজা ফল সংগ্রহের পর ১৩ শতাংশ তরল মোমের আবরণ দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায়ও ২৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

২০. মাল্টার চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: মাল্টা
ইংরেজি নাম: Sweet orange
বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus sinensis*

ভূমিকা: মিষ্টি কমলা বা Sweet orange (Citrus sinensis) বাংলাদেশে মাল্টা নামে পরিচিত। কমলার সাথে এর মূল পার্থক্য হল কমলার খোসা ঢিলা কিন্তু মাল্টার খোসা সংযুক্ত (টাইট)। সাইট্রাস ফসলের মধ্যে মাল্টা অন্যতম জনপ্রিয় ফল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সাইট্রাস ফলের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাল্টা। ভিয়েতনাম, উত্তর পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ চীন মাল্টার আদি উৎপত্তি স্থান। তবে বর্তমানে এই ফলটি বিশ্বের উষ্ণ ও অব-উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় বেশি চাষাবাদ হচ্ছে। বাংলাদেশেও এই ফলটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কমলার তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকায় সহজেই এটি চাষ করা যাচ্ছে। উন্নত জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।

পুষ্টিগুণ:

ভিটামিন (প্রতি ১০০ গ্রাম): ভিটামিন বি ২ (রিবোফ্লাভিন) ০.০৪৬ মিগ্রা, ভিটামিন বি ১ (থায়ামিন) ০.১১৩ মিগ্রা, ভিটামিন সি ৬৫.৬৯ মিলিগ্রাম।

জাত

বারি মাল্টা-১: নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাটো, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত সময়ে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারী আকৃতির (১৫০ গ্রাম)। ফলের দৈর্ঘ্য ৭ সেমি এবং প্রস্থ ৫ সেমি। পাকা ফলের রং সবুজ। ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরো ও শাসের সাথে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (৭.৮%)। গাছ প্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি মাল্টা-২: বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বারিলেবু-৪' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৭ সালে জাত হিসাবে অনুমোদন করা হয়। বারি মাল্টা-২ একটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল আহরণের সময় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল, ঝোপালো স্বভাবের। পাতা উপবৃত্তাকার, পত্র ফলকের অগ্রভাগ সূঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ছোট, উভয়লিঙ্গিক, পাঁচ (৫) পাপড়ি বিশিষ্ট। অনেকগুলো ফুল সাইম সাদৃশ্য পুষ্প মঞ্জুরীতে সাজানো থাকে। ফুলে ৫ টি বৃত্যাংশ বিদ্যমান। ফল উপবৃত্তাকার ও তুলনামুলকভাবে বড় (প্রতি ফলের গড় ওজন ১৭৯ গ্রাম), ফলের উপরিভাগ মসৃণ, দেখতে সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ৭.৫%। ফল সাধারণত গুচ্ছাকারে ধরে। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১১ টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭২.৯৫%। ফলে ১১-১২ টি পর্যন্ত বীজ বিদ্যমান।

বংশবিস্তার

বীজ ও কলমের মাধ্যমে মাল্টার বংশ বিস্তার করা যায়। পরিপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই নার্সারিতে স্থাপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। তবে বীজের চারা আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় করে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করাই উত্তম। তাছাড়া কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করলে সেটার মাতৃগুণাগুণও ঠিক থাকে এবং দ্রুত ফল ধরে। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম

গ্রাফটিং এর জন্য প্রথমে রুটস্টক (আদিজোড়) উৎপাদন করতে হবে। রুটস্টক হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, কাটা জামির, রংপুর লাইম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কাঙ্খিত মাতৃগাছ হতে সায়ন (উপজোড়) সংগ্রহ করে রুটস্টকের উপর স্থাপন করে মাল্টার গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। রুটস্টক হিসেবে ১.০ হতে ১.৫ বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়ন তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং উভয় পদ্ধতিতেই মাল্টার কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে রুটস্টক ও সায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সায়নের চোখ ফুটে কুঁশি বের হয়। কলম হতে একাধিক ডাল বের হলে সুস্থ সবল ও সোজাভাবে বেড়ে উঠা ডালটি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে উৎপন্ন কুশি নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে।

জন্মস্থান/উৎস: Citrus sinensis, পোমেলো (Citrus maxima) এবং ম্যান্ডারিন (Citrus reticulata) এর মধ্যে একটি হাইব্রিড, যা মিষ্টি কমলা নামেও পরিচিত। ঠিক কখন এবং কোথায় এই ক্রস সংঘটিত হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না, যদিও কিছু প্রমাণ থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ চীন উৎপত্তিস্থল হতে পারে। সাইট্রাস নামটি ক্লাসিক্যাল ল্যাটিন থেকে এসেছে। নির্দিষ্ট এপিথেট সিনেনসিস মানে "চীন থেকে", এবং এই উদ্ভিদের প্রাথমিক গৃহপালনের কেন্দ্রকে বোঝায়।

জলবায়ু ও মাটি

কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল অর্থাৎ শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মাল্টা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মাল্টার ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। বাতাসের অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপ্রবন এলাকায় মাল্টা ফলের খোসা পাতলা হয় এবং ফল বেশি রসালো ও নিম্নমানের হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নত মানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মাল্টা গাছ আলো পছন্দ করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মালেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মাল্টা জন্মে, তবে ৫.৫-৬.৫ অম্লতায় (pH) ভাল জন্মে। মাল্টা জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না এবং উচ্চমাত্রার তাপ ও লবণের প্রতি সংবেদনশীল।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী-উঁচু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং আশে পাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে মাল্টা চারা লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪.০ মিটার দূরত্বে ৭৫ সেমি দ্ধ ৭৫ সেমি দ্ধ ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ

গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তেও মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়স ভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো।

গাছের বয়স (বছর)	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ					
	গোবর সার (কেজি)১২	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	৫
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	৮
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১০
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১২
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	১৫

প্রতিবছর মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) বর্ষার পূর্বে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার পর মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমন

বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সেচ

ভাল ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: মাল্টা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া পানি তেউড় বা Water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। ফল পাতলা-করণ ও ব্যাগিং বারি মাল্টা-১ এর গাছে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দু'টি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ণ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকা মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

ছোট পাতার রোগ: পাতার সামান্য রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য, বিভিন্ন পর্যায়ে জিঙ্ক সালফেট ১.০ শতাংশ দ্রবণ + টিপল ১মিলি/লিটার দ্রবণে স্প্রে করুন।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ হালকা সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ হতে থাকে। বারি মাল্টা-১ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আহরণ করা হয়। পরিপক্ক ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভাল মানের ফলগুলো প্রয়োজনে গ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।



সাব-ট্রপিক্যাল অঞ্চলের জনপ্রিয় ফল-ফসলের চাষ পদ্ধতি



২১. অ্যাভাকাডো ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: অ্যাভোক্যাডো
ইংরেজি নাম: Avocado
বৈজ্ঞানিক নাম: *Persea americana*
গোত্র: Lauraceae

ভূমিকা

বাংলাদেশে যেসব বিদেশি ফলের চাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তার মধ্যে অ্যাভোকাডো অন্যতম। অন্যান্য ফলের তুলনায় এ ফলের মিষ্টতা কম হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অতি উপযোগী। এ ফলের আকার অনেকটা পেয়ারা বা নাশপাতির মতো। একেকটা ফলের ওজন প্রায় ৩০০-৭০০ গ্রাম হয়। ফলের ভেতরে বেশ বড় ডিম্বাকার বীজ থাকে। আহার্য্য অংশ মাখনের মত মসৃণ, হালকা মিষ্টি স্বাদের। একই কারণে অনেকের কাছে এটি মাখন ফল নামে পরিচিত।

ঔষধিগুণ

অ্যাভোকাডো একটি চমৎকার ফল। বেশিরভাগ ফলের মধ্যে মূলত কার্বোহাইড্রেট থাকে তবে অ্যাভোকাডোতে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। অ্যাভোকাডো ফলের উপকারীতা অগণিত। রক্তচাপ কমাতে, ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে এবং ধমনী ফলকের ধীর বিকাশ ঘটাতে অ্যাভোক্যাডো খুবি উপকারী। তাছাড়া অস্বাভাবিক হার্ট স্পন্দন, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা হ্রাস করতে অ্যাভোকাডোর তুলনা নেই। প্রতিদিনের একটি অ্যাভোক্যাডো হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। প্রতিদিনের খাবার তালিকায় অ্যাভোকাডো রাখলে আপনার খাবার খুব ভালোভাবে হজম হবে। সেই সাথে কোষ্ঠ্য কাঠিন্যের মত সমস্যা দূর হবে। অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি রয়েছে। আর ভিটামিন বি শরীরকে রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করে। এছাড়া অ্যাভাকাডোতে যে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং উদ্ভিজ্জ খনিজ রয়েছে তা ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। অ্যাভোকাডোতে যে ম্যাগনেসিয়াম থাকে তা শরীরের ক্লান্তি দূর করে এবং ভালো ঘুম হতে সাহায্য করে। অ্যাভোকাডো হলো ওজন কমানোর উপযোগী খাবার। অ্যাভোকাডোতে লুটেন এবং জেক্সানথিন থাকে। লুটেইন এবং জেক্সানথিন উভয়ই চোখের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। অ্যাভোকাডোতে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের ৪৫% আরডিএ থাকে যা ত্বক ময়েশ্চারাইজ করতে সহায়তা করে এবং ত্বকে লাবণ্য আনতে সাহায্য করে।

পুষ্টিগুণ

অ্যাভোক্যাডো হলো পুষ্টিতে ভরপুর একটি চমৎকার ফল যা আধুনিক ডায়েটের সকল ধরনের পুষ্টির অভাব পূরণ করতে সহায়তা করে। প্রতি ১০০ গ্রাম অ্যাভোকাডোতে পুষ্টি রয়েছে শক্তি ১৬০ কিলোক্যালোরি,কার্বোহাইড্রেট ৮.৫৩ গ্রাম, শর্করা ০.৬৬ গ্রাম, ফাইবার ৬.৭ গ্রাম, চর্বি ১৪.৬৬ গ্রাম, প্রোটিন ২ গ্রাম, বিটা-ক্যারোটিন ৭ মাইক্রো গ্রাম, লুটেইন ৬২ মাইক্রো গ্রাম, জিক্সনথিন ২৭১ মাইক্রো গ্রাম

থায়ামিন ০.০৬৭ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.১৩ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ১.৭৩৮ মিলিগ্রাম, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ১.৩৮৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ৬ ০.২৫৭ মিলিগ্রাম, ফোলেট ৮১ মাইক্রো গ্রাম, ভিটামিন সি ১০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ই ২.০৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে ২১ মাইক্রো গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৫৫ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৪৮৫ মিলিগ্রাম, দস্তা ০.৬৪ মিলিগ্রাম।

জন্মস্থান/উৎস

অ্যাভোকাডো হচ্ছে মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার স্থানীয় উদ্ভিদ।পূর্ব এবং মধ্য মেক্সিকো থেকে শুরু করে গুয়াতেমালা অতিক্রম করে মধ্য আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় কুল পর্যন্ত অ্যাভোকাডো দেশীয় ফল হিসেবে চাষ হয়ে থাকে।

জাত

বারি এ্যাভোকেডো-০১: উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। ফলের বোঁটার গোড়া সামান্য উচু ও ফল বড় আকারের (প্রতিফলের গড় ওজন ৫৬২.৩ গ্রাম), ফল দেখতে সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ১৪.৬%। গাছ প্রতি গড় ফলের সংখ্যা ১৮৯টি এবং গড় ফলন ১০৬.৩ কেজি/গাছ/বছর এবং ১০.৬ টন/হে./বছর।

মাটি ও জলবায়ু

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি উপযোগী। অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটিতে জন্মে থাকে। পিএইচ ৫.০-১০.০। ইহা অধিক বিস্তৃত মাটি যেমন বরেন্দ্র ও পাহাড়ী এলাকায় উৎপাদন করা যেতে পারে। এ্যাভোকেডো গাছ নিম্ন তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় (৪-৪৫০ সে.) জন্মাতে পারে।

জমি প্রস্তুতকরণ

এ্যাভোকেডো গাছ সমতল ভূমিতে আয়তাকার পদ্ধতিতে, পাহাড়ী এলাকায় সীমিত ঢালে কন্টুর টেরেস পদ্ধতিতে লাগানো হয়ে থাকে। প্রথমে গভীর চাষ দিয়ে জমি থেকে সমস্ত ধরনের বহুবর্ষজীবি আগাছা ও জঙ্গল পরিস্কার করে নিতে হবে এবং গর্ত তৈরী করতে হবে।

গর্ত তৈরী ও সার প্রয়োগ

৬০ সেমি x ৬০ সেমি x ৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরী করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার ও ১৫০ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করে চারা রোপণের আগে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

চারা রোপণ

এ্যাভোকেডো বীজ ও কলমের চারা রোপণ করা হয়। পাকা ফলের বীজ আহরণের সাথে সাথেই সীড বেড অথবা পলি ব্যাগের মাটিতে রোপণ করতে হবে। চারার একটা নির্দিষ্ট বয়সে গ্রাফটিং করা হয়।

রোপণ দূরত্ব

সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-১৮ মি.।

সার প্রয়োগ

গাছের বর্ধনশীল অবস্থায় সাধারণত প্রতি বছর ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ, ১০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বর্ষার আগে ও পরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

সাধারণত এ্যাভোকেডো গাছে সেচ দেয়া হয় কিন্তু ইহা দীর্ঘ খড়া সহ্য করতে পারে। ফলের গুণগত মান ও ফলন বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক মৌসুমে ২/৩ বার সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

গাছের অঙ্গ ছাটাই

গাছের সুন্দর আকার দেয়ার জন্য নীচ থেকে অতিরিক্ত ডাল পালা ছেটে দিয়ে ১-১.৫ মি. উচু ট্রাংক তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতি বছর নিয়মিত রোগাক্রান্ত ও অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ডাল ছেটে দিতে হবে।

ফল ছাটাই

ফলন্ত গাছে অতিরিক্ত ফল ছিড়ে ফেলে দিতে হবে যাতে ফল বড় হতে পারে।

আন্ত:পরিচর্যা

গাছের গোড়া থেকে চতুর্দিকে প্রায় ১ মি. জায়গা সর্বদা পরিস্কার পরিছন্নব রাখতে হবে। আগাছা দমন করতে হবে। মাঝে মাঝে নিড়ানী দিয়ে মাটি আচড়ায়ে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফল বড় হলে আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ফলন: কুড়ি বছরের অ্যাভোকাডো গাছে বছরে ১৮৯টি ফল ধরে যার প্রতিটি ফলের ওজন ৫৬২ গ্রাম এবং প্রতি গাছে ১০৬ কেজি এবং ফলন ১০.৬ টন/হে.।

পোকামাকড় ও রোগবালাই

ফাইটোফথোরা রুট রট: অল্প বয়স্ক আভাকাডো গাছে, ফাইটোফথোরা মূল পচনের প্রথম লক্ষণ হল পাতা ঝরে যাওয়া, যা প্রায়শই গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। আক্রান্ত গাছের শিকড় বাদামী বা কালো দেখায় এবং স্পর্শে নরম ও স্পঞ্জি। পরিপক্ক অ্যাভোকাডো গাছে, ফাইটোফথোরা মূল পচনের লক্ষণগুলি কম লক্ষণীয় হতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়:

- জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।
- উপযুক্ত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

স্ক্যাব রোগ: স্ক্যাব রোগের প্রথম লক্ষণ সাধারণত পাতায় দেখা যায়। পাতার উপরিভাগে ছোট, বৃত্তাকার বা অনিয়মিত আকৃতির ক্ষত দেখা যায়। এই ক্ষতগুলি বাদামী বা কালো এবং একটি উঁচু প্রান্ত থাকতে পারে। ফলের গায়ে ক্ষত দেখা দিতে পারে। এই ক্ষতগুলি পাতার মতই ফল বিকৃত হয়ে যেতে পারে। ফল ফাটতে পারে ও অকালে ফল ঝরে যেতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়:

- স্যানিটেশন অনুশীলন করতে হবে। উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে করতে হবে।
- প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।
- কীটপতঙ্গের ভেক্টরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যেমন লীফহপার এবং মেলিবাগ।
- সঠিক নিষ্কাশন, সেচ এবং সার ব্যবস্থাপনা রোগের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করতে পারে।

ব্যাকটেরিয়াল ক্যানকার: ব্যাকটেরিয়াল ক্যানকার একটি সাধারণ রোগ যা অ্যাভোকাডো গাছকে প্রভাবিত করে এবং সিউডোমোনাস সিরিঞ্জি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়। ব্যাকটেরিয়া গাছের ছালের উপর ক্ষত দ্বারা সংক্রামিত হয়, সাধারণত ছাঁটাই, শিলাবৃষ্টি বা পোকা খাওয়ার কারণে হয়। একবার গাছের ভিতরে, ব্যাকটেরিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং ক্যানকার বা ছালের উপর ফোলা জায়গা সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়াল ক্যানকার অ্যাভোকাডো ফলকেও প্রভাবিত করে, যার ফলে ছোট, জলে ভেজানো ক্ষত হয় যা শেষ পর্যন্ত বাদামী হয়ে যায় এবং শুকিয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণের উপায়:

- সঠিক নিষ্কাশন, সেচ এবং সার ব্যবস্থাপনা রোগের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করতে পারে।
- রোগের বিস্তার রোধ করার জন্য সংক্রামিত উদ্ভিদ উপাদান অপসারণ এবং ধ্বংস করা উচিত।
- ব্যাকটেরিয়ানাশক ব্যবহার করে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণও রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হতে পারে।

মাকড়: মাকড়ের আক্রমণে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় ও কুঁকড়ে যায় ।

নিয়ন্ত্রণের উপায়:

- সানমেকটিন/ভেরটিমেক/রনভিট ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

মিলি বাগ: পোকার আক্রমণে ডালে ও পাতায় সাদা সাদা তুলোর মতো দেখা যায় ।

নিয়ন্ত্রণের উপায়:

টাফগর/ সানগর/মিপসিন ২ গ্রাম/লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২২. পিচ ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: পিচ
ইংরেজি নাম: Peach
বৈজ্ঞানিক নাম: *Prunus persica (L.) Batsch*
গোত্র: Rosaceae

ভূমিকা

পিচ গাছ মাঝারি আকারের বৃক্ষ, পাতা অনেকটা ডালিম পাতার মতো দেখতে। পাতার গোড়ায় অনেক ছোট ছোট পাতা থাকে। ফুলের রঙ লাল বা গোলাপি। ফল দেখতে ডিম্বাকার তবে মুখটা আমের মতো বাকানো ও সুচালো। কাঁচা ফলের রঙ সবুজ পাকলে হালকা হলুদের ওপর লাল আভা সৃষ্টি হয়। কাঁচা ফল শক্ত, খোসা খসখসে। কিন্তু পাকলে নরম হয়ে যায় ও টিপ দিলে সহজে ভেঙে যায়। পাকা ফলের রসালো শাঁস হালকা হলুদ ও ভেতরের দিকে লাল, শাঁসের স্বাদ টক। ফলের মধ্যে খয়েরি রঙের একটা শক্ত বিচি থাকে। পিচ ফলটি শীতপ্রধান এলাকায় ভালো জন্মে। সাভার, গাজীপুর, সৈদয়পুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকায় বেশ কিছু পীচ ফলের গাছ চোখে পড়ে।

ঔষধিগুণ

পিচ দেখতে যেমন সুন্দর, শরীরের পক্ষেও তেমনই উপকারী। আবার রূপচর্চায় পিচের গুণের কথাও কারও অজানা নয়। পিচ বিটা ক্যারোটিনে ভরপুর। এই বিটা ক্যারোটিন দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখার অন্যতম উপাদান। একটা পিচের মধ্যে ৬৮ ক্যালরি থাকার পাশাপাশি ফ্যাটের পরিমাণ শূন্য। তাই প্রতিদিন ডায়েটে পিচ রাখলে তা ওজন কমাতেও সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকার কারণে অনেক ক্রনিক সমস্যা ও ক্যানসারের প্রকোপ দূরে রাখতে পারে পিচ। পিচের মধ্যে থাকা পটাশিয়াম কিডনি পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি থাকার কারণে ত্বকের ডার্ক সার্কল ও বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে পিচ। অনেক কসমেটিকসেও পিচ ব্যবহার করা হয়।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম পিচে রয়েছে শক্তি ৩৯ কিলোক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ৯.৫৪ গ্রাম, ফাইবার ১.৫ গ্রাম, ফ্যাট ০.২৫ গ্রাম, প্রোটিন ০.৯১ গ্রাম, বিটা-ক্যারোটিন ১৬ মাইক্রো গ্রাম, থায়ামিন (ই১) ০.০২৪ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন (ই২) ০.০৩১ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.৮০৬ মিলিগ্রাম, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ০.১৫৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি৬ ০.০২৫ মিলিগ্রাম, ফোলেট ৪ মাইক্রো গ্রাম, কোলিন ৬.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৬.৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন ই ০.৭৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে ২.৬ মাইক্রো গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.২৫ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ৯ মিলিগ্রাম, দস্তা ০.১৭ মিলিগ্রাম, পানি ৮৯ গ্রাম।

জাত

আমাদের দেশের কোন জাত নেই। তবে বিদেশী কিছু জাত রয়েছে যা আমাদের দেশে চাষ করা যেতে পারে, যেমন- ডেজার্ট গোল্ড, ডিক্সি রেড, আর্লি হ্যাল, আর্লি অ্যাম্বার, ইত্যাদি।



জন্মস্থান/উৎস

ধারনা করা হয় পীচ পারস্যের অদি ফসল। পীচের চাষকৃত রূপটি এসেছে চীন থেকে। স্পেনের বিজ্ঞানী আমেরিকায় পীচ প্রবর্তন করেছিলেন। বিশ্বের বেশিরভাগ নাতিশীতোষ্ণ দেশে পীচ একটি বাণিজ্যিক এবং ঘরোয়া ফল হিসাবে জন্মে। প্রধান পীচ উৎপাদনকারী দেশগুলি হল ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, চীন, ফ্রান্স, গ্রীস, রাশিয়া, মেক্সিকো, জাপান এবং আর্জেন্টিনা।

জন্মস্থান/উৎস: পারস্য

মাটি

এটি অবশ্যই উর্বর, ভালভাবে শুকানো এবং ৬ থেকে ৭ এর পিএইচ সহ জমিতে ভাল জন্মে।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে পিচ গাছের বংশ বিস্তার করা যায়।

কাটিংঃ ৩০-৩৫ সেমি দীর্ঘ শাখা কেটে গর্ত করে রোপণ করতে হয়। চারার জন্য আধা ছায়ায় স্থাপন করা হবে। এক মাস পরে এটি নিজস্ব শিকড় নির্গত করবে এবং চারা গাছে পরিনত হয়।

গ্রাফটিংঃ কুঁড়ি গ্রাফটিং দ্বারা সহজে বংশ বিস্তার করা যায়।

চারা রোপণ: পীচগুলি জানুয়ারির শেষে গর্তে রোপণ করা হয়।

সারি থেকে সারির দূরত্বঃ ৪-৫ মিটার
গাছ থেকে গাছের দূরত্বঃ ৪ মিটার

গর্তের আকার: ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৬০ সেমি গর্ত তৈরি করতে হয়।



গর্তে সার প্রয়োগঃ প্রতিটি গর্তে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গোবর অথবা কম্পোস্ট ১০-১৫ কেজি, ৩-৫ কেজি ছাই, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম, জিপসাম ১৫০ গ্রাম, দস্তা ১০ গ্রাম ও বোরন ১ গ্রাম পরিমাণে ভালভাবে উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে উপরের মাটি নিচে আর নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।



গাছের পরিচর্যা

চারা রোপণের পরপরই, স্টেকিং প্রদান করা হয়। বিশেষত বাঁশ বা অন্যান্য কাঠের লগ দিয়ে স্টেকিং দিতে হয়। অল্প বয়স্ক গাছগুলিকে ঘন ঘন বিরতিতে পানি সেচ দেওয়া উচিত।

ট্রেনিংঃ পীচ গাছগুলিকে ৯০-১০০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় গাছের কান্ড কেটে ফেলতে হবে। গাছের সমস্ত শাখা আবার দুটি কুঁড়ি পর্যন্ত কাটা হয়। ট্রাঙ্কের চারপাশে ভাল ব্যবধানে থাকা তিন থেকে পাঁচটি পার্শ্বীয়কে বিকশিত হতে দেওয়া হয়।

ফল পাতলা করনঃ অল্প বয়সী গাছের সবল ফল কেটে ফেলতে হয়। পরিপূর্ণ গাছের ফল পাতলা করা উচিত, ফলে অনেক বড় আকারের ফল পাওয়া যায় যায় । হাত দিয়ে পাতলা করার সময়, প্রাকৃতিকভাবে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে এমন ফলগুলিকে অপসারণ করার জন্য প্রথমে ডালগুলি ঝাঁকান। যদি এখনও উদ্বৃত্ত ফল থাকে তবে শাখাগুলির উপর থেকে নীচের দিকে পাতলা করা শুর করন। প্রতি ফলের পাতার গড় সংখ্যা ২০-২৫ হওয়া উচিত।

সার প্রয়োগঃ গাছ প্রতি FYM ৬০ কেজি, নাইট্রোজেন ২৫ গ্রাম, P2O5 ২৫০ গ্রাম এবং K2O ৬০০ গ্রাম সার প্রয়োগ করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ

পীচ ফলগুলি শক্ত অবস্থায় সংগ্রহ করা হয় জাতে সেগুলি স্টোরেজ বা ট্রানজিটে পাকা সমপন্ন হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

লাল মাকড়সা: এটি এমন একটি মাইট যাঁর চেহারা মাকড়সার সাথে খুব একই রকম তবে ছোট। পাতাগুলি বর্ণহীনতার কারণ হয়।

নিয়ন্ত্রণের উপায়:

এটি অ্যাকেরিসাইড বা এর সাথে লড়াই করা হয় নিম তেল (আপনি এটি কিনতে পারেন) এখানে)।

এফিডস: এগুলি হলুদ, বাদামী বা সবুজ বর্ণের প্রায় ০.৫ সেন্টিমিটারের পরজীবী যা পাতার কোষ এবং ফুলের কুঁড়িগুলিতে খাওয়ায়।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

এগুলি হলুদ বর্ণের স্টিকি ফাঁদগুলির সাথে লড়াই করা হয় (এগুলির মতো এখানে)

ফলের মাছি: এটি এমন একটি মাছি যার লার্ভা সব ফল খায়। রোগের মধ্যে পাউডারি মিল ডিউ, ব্রাউন স্পট, ভাইরাস, ক্রাউন গল, ইত্যাদি রোগ সচরাচর দেখা যায়।



২৩. কিউয়ি ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: কিউয়ি ফল
ইংরেজি নাম: KiwiFruit
বৈজ্ঞানিক নাম: *Actinidia deliciosa*
গোত্র: Actinidiaceae

ভূমিকা

কিউয়ি একটি লতানো জাতীয় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল কিউই ফল। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রায়ই সংক্ষিপে কিউই বলা হয় অথবা চাইনিজ গুজবেরি হল অ্যাক্টিনিডিয়া প্রজাতির বিভিন্ন প্রজাতির কাঠের লতাগুলির ভোজ্য বেরি। কিউই ফলের সবচেয়ে সাধারণ চাষযোগ্য শ্রেণী (অ্যাক্টিনিডিয়া ডেলিসিওসা 'হেওয়ার্ড')। এটি ডিম্বাকৃতি, প্রায় একটি বড় মুরগির ডিমের আকার: দৈর্ঘ্য ৫.৮ সেন্টিমিটার (২.৩ ইঞ্চি) এবং ব্যাস ৪.৫-৫.৫ সেমি। এটি একটি পাতলা, অস্পষ্ট, তন্তুযুক্ত, টার্ট কিন্তু ভোজ্য হালকা বাদামী চামড়া এবং ছোট, কালো, ভোজ্য বীজের সারি সহ হালকা সবুজ বা সোনালী মাংস রয়েছে। ফলের একটি মিষ্টি এবং অনন্য গন্ধসহ একটি নরম টেক্সচার রয়েছে।

ঔষধিগুণ

কিউই ফলের বিশেষ কিছু উপকারীতা দেওয়া হলো: কিউই ফলের ভিটামিন সি এর পরিমান লেবু এবং কমলার চেয়ে দ্বিগুণ। ভিটামিন সি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে ও ফ্রিয়্যাডিকেলগুলি দূর করে যা প্রদাহ বা ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। এমনকি এটি ক্ষতিকারক রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কিউই ফলে রয়েছে সেরোটোনিন যা ঘুম সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় বেশ উপকারী। তাইতো ঘুমানোর এক ঘন্টা আগে ২টি কিউই ফল ঘুম বর্ধক হিসাবে কাজ করে। কিউই ফলের মধ্যে অ্যাক্টিনিডেইন নামক এনজাইম রয়েছে যা এর পেঁপের মধ্যকার পেপেইন এর মত হজম প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। ফলটি ডায়েটার ফাইবার-যুক্ত, যা হৃদরোগ এবং করোনারি হার্ট ডিজিজ উভয়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। উচ্চতর ফাইবারযুক্ত খাবারগুলি দীর্ঘক্ষণ পাকস্থলীতে থাকে এবং রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ব্যাডস্যুগার নিয়ন্ত্রণ ও ওজন হ্রাস করে এবং ডায়াবেটিস রোগীদের কিউই খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি রক্তের পিএইচ এর ভারসাম্য ঠিক রাখে যা ত্বকের তারণ্যতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

পুষ্টিগুণ

প্রতি ১০০ গ্রাম এ রয়েছে শক্তি ৬১ কিলোক্যালোরি, শর্করা ১৪.৬৬ গ্রাম, খাদ্য আঁশ ৩ গ্রাম, স্নেহ পদার্থ ০.৫২ গ্রাম, প্রোটিন ১.১৪ গ্রাম, থায়ামিন (বি১) ০.০২৭ মিগ্রা, রিবোফ্লাভিন (বি২) ০.০২৫ মিগ্রা, নায়াসিন (বি৩) ০.৩৪১ মিগ্রা, প্যানটোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) ০.১৮৩ মিগ্রা, ভিটামিন বি৬ ০.০৬৩ মিগ্রা, ফোলেট (বি৯) ২৫ মাইক্রো গ্রাম, কোলিন ৭.৮ মিগ্রা, ভিটামিন সি ৯২.৭ মিগ্রা, ভিটামিন ই ১.৪৬ মিগ্রা, ভিটামিন কে ৪০.৩ মাইক্রো গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৪ মিগ্রা, লৌহ ০.৩১ মিগ্রা, সেলেনিয়াম ০.২ মাইক্রো গ্রাম, জিংক ০.১৪ মিগ্রা, পানি ৮৩ গ্রাম।

জাত

বাংলাদেশে কিউয়ি ফলের কোন জাত নাই। তবে বিশ্ব ব্যাপী এই ফলের অনেক জাত আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি জাত হলো- ফুজি কিউয়ি ফল, গোল্ডেন কিউয়ি ফল, বেবি কিউয়ি ফল, আর্কটিক কিউয়ি ফল, রেড কিউয়ি ফল, সিলভার ভাইন, পার্পল কিউয়ি ফল এবং চাইনিজ গুজবেরী।

জন্মস্থান/উৎস

কিউয়ি নিউজিল্যান্ডের ফল হিসেবে পরিচিত হলেও এর আদি নিবাস চীনের দক্ষিণাংশে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মিশনারিদের মাধ্যমে কিউয়ি চীন থেকে নিউজিল্যান্ডে আসে এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ইটালি, গ্রিস ও ফ্রান্সে। ১৯০৬ সাল থেকে কিউয়ি বহির্বিশ্বে পরিচিতি লাভ শুরু করলেও বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ করা শুরু হয় ১৯৩৭ সালে। নিউজিল্যান্ড ছাড়াও চিলি, তুর্কি, ইরান, জাপান, আমে-রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কিউয়ি ফল বানিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়।

মাটি ও আবহাওয়া

জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ও সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটি কিউয়ি চাষের জন্য উপযোগী। মাটির উপযোগী pH অবশ্যই ৬.৫ -৭.০ হতে হবে। উষ্ম ও আর্দ্র আবহাওয়া কিউয়ি চাষের জন্য উপযোগী। এই ফল সমুদ্রতল থেকে ৮০০-১৫০০ মিটার উঁচু জমিতে ভাল জন্মে। গাছ বড় হওয়া থেকে গাছে ফুল আসা অব্দি বার্ষিক ১৫০-২০০ সেমি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। প্রখর সূর্যতাপ ফল ধারনে ব্যাঘাত ঘটায়। ভালো ফলনের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ৩০-৩৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

জমি তৈরি

জমি ৪-৫ টা চাষ দিয়ে মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমি ভালোভাবে আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। জমি শেষ চাষের সময় জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

গর্ত তৈরি

চারা লাগানোর পূর্বে গর্ত তৈরি করে নিতে হবে। গাছ সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়।

চারা রোপণ

টি-বার ও পারগোলা সিস্টেমে কিউয়ি বাগান করা হয়। কিউয়ি চারা রোপণের জন্য গাছ থাকে গাছের দূরত্ব হবে ৫-৬ মি.এবং সারি থাকে সারির দূরত্ব ৪ মিটার। প্রথমে নার্সারি বেডে চারা লাগানোর হয়। পরে ট্রান্সপ্লান্টিং করা হয়। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয়। ১টি পুরুষ গাছ দ্বারা ৯টি স্ত্রী গাছের সফলভাবে পরাগায়ন সম্ভব। পতঙ্গ দ্বারাও পরাগায়ন হয়ে থাকে।

রোপণের সময়

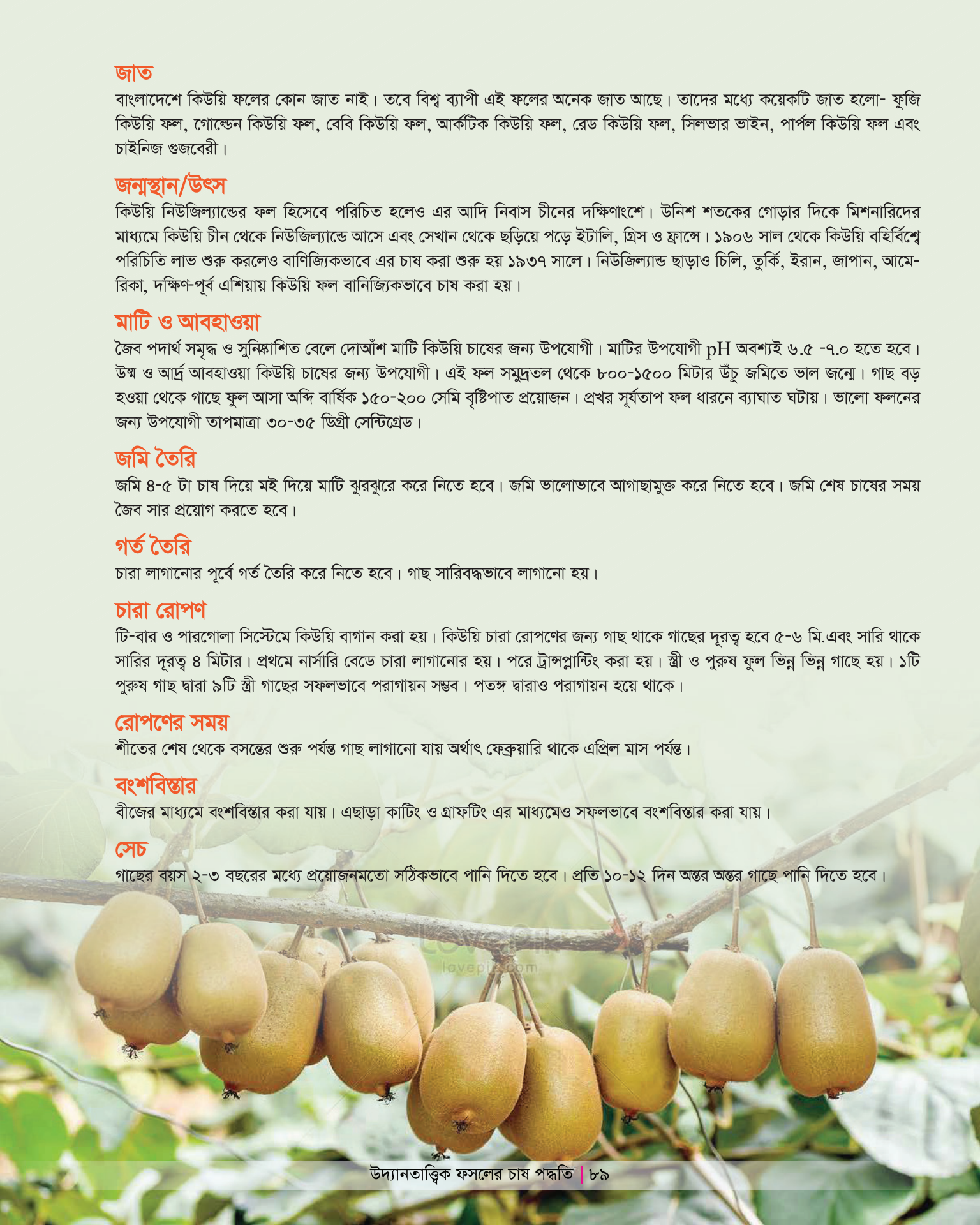
শীতের শেষ থেকে বসন্তের শুরু পর্যন্ত গাছ লাগানো যায় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি থাকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত।

বংশবিস্তার

বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। এছাড়া কাটিং ও গ্রাফটিং এর মাধ্যমেও সফলভাবে বংশবিস্তার করা যায়।

সেচ

গাছের বয়স ২-৩ বছরের মধ্যে প্রয়োজনমতো সঠিকভাবে পানি দিতে হবে। প্রতি ১০-১২ দিন অন্তর অন্তর গাছে পানি দিতে হবে।





সার ব্যবস্থাপনা

বেসাল ডোজ হিসেবে ২৫ কেজি গোবর সার দিতে হবে। গাছের বয়স ১-৫ বছরের মধ্যে প্রতি গাছে ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৩৫০ গ্রাম এবং এমওপি ৫০০ গ্রাম দিতে হবে। গাছের বয়স ৫ বছরের পরে প্রতি গাছে ইউরিয়া ৯০০ গ্রাম, টিএসপি ৬০০ গ্রাম এবং এমওপি ৯০০ গ্রাম করে প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন

ভালো ফলন পাওয়ার জন্য নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে। অতিরিক্ত আগাছা হলে প্রয়োজনে আগাছানাশক ব্যবহার করতে হবে।

মালচিংঃ মালচিং করতে হবে।



সাথী ফসল চাষ

কিউয়ি চাষের জমি বা বাগান থাকে বাড়তি আয়ের জন্য কৃষক কিউয়ি গাছে ফল ধরার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ গাছের বয়স ৪-৫ বছরের মধ্যে সাথী ফসল লাগাতে পারবেন। সবজি ও লিগিউম জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে।

প্রুনিং

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রুনিং করতে হবে। কিউই লতাগুলি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত বোঝা হয়ে যায় বলে ছাঁটাই করা প্রয়োজন। লতা রোপণের সাথে সাথে ছাঁটাই শুরু করা উচিত। প্রথম বছরে কীভাবে একটি কিউই কাটা যায় তার উপর ফোকাস করার পরিবর্তে, প্রধান ফোকাস সোজা বৃদ্ধি এবং একটি শক্তিশালী কাঠামোর উপর হওয়া উচিত। লতাটিকে খুঁটির সাথে আলগা করে বেঁধে রাখুন এবং এটিকে সোজা করে বাড়তে থাকুন। লতাগুলি খুঁটির চারপাশে আবৃত করা উচিত নয়। যতক্ষণ না লতা খুঁটির শীর্ষে পৌঁছায় ততক্ষণ সমস্ত পাশের শাখাগুলি কাটা উচিত। শীতকাল ছাঁটাইয়ের জন্য সেরা ঋতু। যদি লতা উপরের দিকে স্বাস্থ্যকর ডাল তৈরি না করে, তবে মূল শাখাটিকে প্রায় ২ ফুট ছাঁটাই করুন এবং এটিকে বাড়ানোর চেষ্টা করুন এবং পরের বছর আবার উপরের দিকে সঠিক ডাল তৈরি করুন।

পোকামাকড় ও রোগ বালাইঃ কিউয়ি গাছে কিছু পোকার উপদ্রপ দেখা যায়। যেমন-লিফ রোলার ক্যাটারপিলার, রুট নোড নেমাটোড ইত্যাদি। কিছু রোগের আক্রমনও দেখা যায়। যেমন- আর্মিলারিয়া রুট রট, ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট, ক্রাউন রট, ক্রাউন গোল, ক্যাঙ্কার ইত্যাদি। ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ

কিউই গাছগুলি ৪-৫ বছর পরে ফল ধরতে শুরু করে, তবে বাণিজ্যিক উৎপাদন ৬-৭ বছর পরে শুরু হয়। তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে, ফল উচ্চ উচ্চতার তুলনায় কম উচ্চতায় দ্রুত পরিপক্ক হয়। বড় ফলগুলি প্রথমে সংগ্রহ করা হয় এবং ছোট ফলগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়তে দেওয়া হয়। শক্ত ফলগুলোকে মোটা কাপড়ে মুড়িয়ে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েকদিন পর, অর্থাৎ ১-২ সপ্তাহ পর ভোজ্য হয়ে যায়।

ফলন

কিউই গাছগুলিতে লতা প্রতি ৫০-১০০ কেজি ফলনের হার পরিলক্ষিত হয়। আন্তঃপরিচর্যার উপর কোন গাছের বা বাগানের ফলন নির্ভর করে থাকে। ৭ বছরের বয়সের গাছ থাকে ২৫ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যেতে পারে।

২৪. ম্যাঙ্গোস্টিন ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: ম্যাঙ্গোসটিন
ইংরেজি নাম: Mangosteen
বৈজ্ঞানিক নাম: *Garcinia mangostana L.*
গোত্র: Clusiaceae

ভূমিকা

ম্যাঙ্গোস্টিন এমন একটি ফল যা স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়। তাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একে অনেকে ফলের রানী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশে সাফল্যজনকভাবে এর চাষ করা সম্ভব। ফল গোলাকার, দেখতে দেশি গাবের মত। পাকা ফলে সাদা রসাল কোয়া থাকে এবং সহজেই ফল থেকে খোসা ছাড়ানো যায়।ম্যাঙ্গোসটিন এটি একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় গাছ যার অনেকগুলি ব্যবহার রয়েছে।

ঔষধিগুণ

ম্যাঙ্গোস্টিন প্রদাহ-প্রতিরোধী, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, অ্যান্টিডায়াবেটিক, স্লিমিং, এনার্জাইজিং, হজম। এটি অ্যালার্জি, ত্বকের সমস্যা এবং শ্বাসযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের রোগগুলির চিকিতসার জন্য ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গোস্টিন ফলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এর অনন্য এন্টিঅক্সিডেন্ট প্রোফাইল। ম্যাঙ্গোস্টিন ত্বকে পাওয়া জ্যান্থোন প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে। টিউব এবং প্রাণী গবেষণা দেখায় যে জ্যান্থোনের একটি প্রদাহ-বিরোধী প্রভাব রয়েছে এবং ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো প্রদাহজনিত রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। এই ফলটি ফাইবার সমৃদ্ধ, যা বেশ কিছু উপকার দেয়। ফলের নির্দিষ্ট উদ্ভিদ যৌগগুলি-জ্যান্থোনস সহ-অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি -ইনফ্লেমেটরি প্রভাব রয়েছে যা ক্যান্সার কোষগুলির বৃদ্ধি এবং বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। ম্যাঙ্গোস্টিন চর্বি বিপাক সক্রিয় করতে এবং ওজন বৃদ্ধি প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। এই ফলের জ্যান্থোন যৌগগুলি স্বাস্থ্যকর রক্তে শর্করার মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। ফল ফাইবারের একটি ভাল উৎস, একটি পুষ্টি যা রক্তে শর্করাকে স্থিতিশীল করতে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করতে সাহায্য করে। এই ফলের কিছু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে ইমিউন স্বাস্থ্যের উপকার করতে পারে। এটি ত্বকের ক্যান্সার এবং বার্ধক্যের লক্ষণগুলির জন্য একটি প্রধান অবদানকারী। এই ফলটি হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক এবং পরিপাকতন্ত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে; এই ফলটি ফাইবারে পরিপূর্ণ। ফাইবার হজম স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য, এবং একটি উচ্চ ফাইবার খাদ্য অন্ত্রের নিয়মিততা উন্নত করতে সাহায্য করে।



পুষ্টিগুণ

ম্যাঙ্গোস্টিন ফলগুলি ডেজার্ট হিসাবে খাওয়া যায় বা পানীয় তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি ভিটামিন বি এবং সি সমৃদ্ধ হওয়ায় এগুলি খুব পুষ্টিকর এবং ম্যাঙ্গোস্টিন ফলগুলি আমাদের ফাইবার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং পটাসিয়ামও সরবরাহ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে রয়েছে শক্তি ৭৩ kcal, কার্বোহাইড্রেট ১৭.৯১ গ্রাম, ফাইবার ১.৮ গ্রাম, ফ্যাট ০.৫৮ গ্রাম, প্রোটিন ০.৪১ গ্রাম, থায়ামিন ০.০৫৪ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.০৫৪ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন ০.২৮৬ মিলিগ্রাম, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ০.০৩২ মিলিগ্রাম, ফোলেট ৩১ মাইক্রো গ্রাম, ভিটামিন সি ২.৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৩ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১৩ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৪৮ মিলিগ্রাম, দস্তা ০.২১ মিলিগ্রাম।

জাত

আমাদের দেশে ম্যাঙ্গোস্টিন এর কোন জাত নেই। বিদেশী জাত হিসাবে কালিগেসিং, পুস্পাহিয়াং, ওনায়াসা, রাতু কামাং, রাতু তেম্বিলাহান, লিংসার, বারদেম ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

জন্মস্থান

মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ইন্দোনেশিয়ার মলুচাস দ্বীপপুঞ্জের চিরসবুজ গাছের স্থানীয়। জনপ্রিয়ভাবে এটি ম্যাঙ্গোস্টিন, ইন্ডিয়ান জাবো বা ম্যাঙ্গোস-টিন নামে পরিচিত।

মাটি

বেলে দো-আঁশ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থযুক্ত উর্বর মাটিকে ম্যাঙ্গোস্টিন চাষের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। সামান্য অম্লীয় pH মান সহ সুনিষ্কাশিত মাটিতে উদ্ভিদটি আরও ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

জলবায়ু

ম্যাঙ্গোসটিন উষ্ণ জলবায়ুতে জন্মায়। শীতকালে এটি যদি ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে পড়ে যায় তবে তা টিকে থাকবে না। গড় বৃষ্টিপাতের ফলে ভালো উতপাদন হয়, কিন্তু দীর্ঘায়িত খরা গাছের উতপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ছায়ায়ও ম্যাঙ্গোস্টিন ভালোভাবে উতপাদন করা যায়। অল্প বয়স্ক গাছগুলি সরাসরি সূর্যের আলোতে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই গাছগুলিকে ছায়ায় বা এমন জায়গায় রাখুন যেখানে তারা পরো বা ফিল্টার করা সূর্যালোক পায়।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে ম্যাঙ্গোস্টিন গাছের বংশবিস্তার কিছুটা কঠিন, কারণ প্রকৃত বীজ সহজে পাওয়া যায় না, তাই একটি গাছ নার্সারী থেকে কেনা উচিত।

রোপন সময়

নতুন গাছ ১২ ইঞ্চি উচচতায় পৌঁছাতে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগতে পারে। মার্চ-এপ্রিল মাসে সাধারণত এই গাছগুলো রোপনের ভাল সময়। রোপণের পরে, এই গাছগুলিতে ফল ধরতে ৭-৯ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সাধারণত দুটি ঋতুতে ফল ধরে থাকে। প্রথমটি জুলাই থেকে অক্টোবর যা বর্ষাকাল এবং দ্বিতীয়টি এপ্রিল-জুন মাসে।

গর্তের আকারঃ ৬০ সেমি ৬০ সেমি ৬০ সেমি

গর্তে সার প্রয়োগ

চারা লাগানোর ১৫ দিন পূর্বে প্রতিটি গর্তে ১০ কেজি গোবর, ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০ গ্রাম ফসফেট, ৯০ গ্রাম পটাশ, ৫০ গ্রাম হাড়ের গুড়া, ১০ গ্রাম বরিক এসিড, ১০ গ্রাম জিংক সালফেট মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে।

সারি থেকে সারির দূরত্বঃ ৮-১০ মিটার
গাছ থেকে গাছের দূরত্বঃ ৮০-১০ মিটার
আগাছা দমনঃ গাছের গোঁড়া সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ

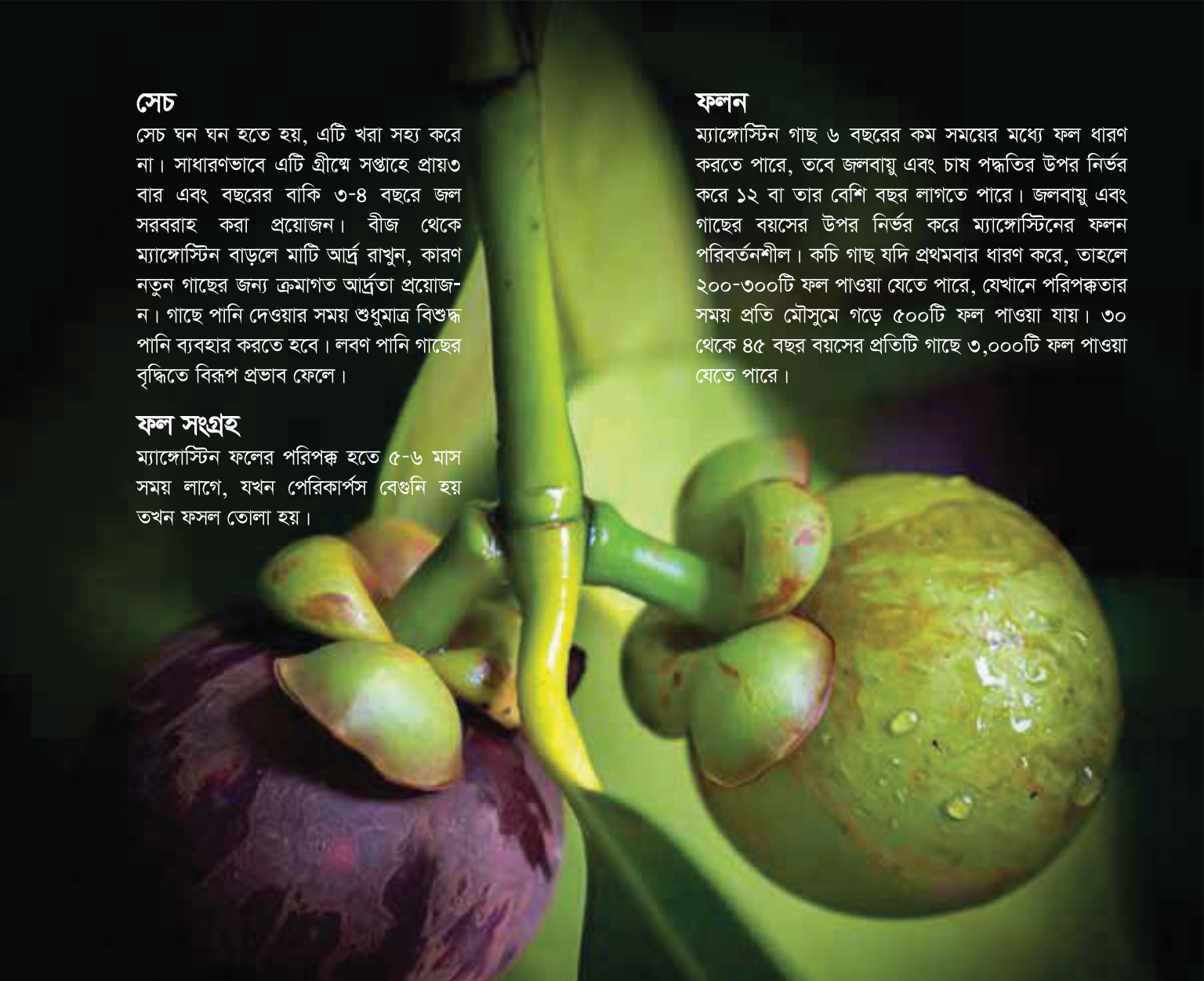
সেচ ঘন ঘন হতে হয়, এটি খরা সহ্য করে না। সাধারণভাবে এটি গ্রীষ্মে সপ্তাহে প্রায়৩ বার এবং বছরের বাকি ৩-৪ বছরে জল সরবরাহ করা প্রয়োজন। বীজ থেকে ম্যাঙ্গোস্টিন বাড়লে মাটি আর্দ্র রাখুন, কারণ নতুন গাছের জন্য ক্রমাগত আর্দ্রতা প্রয়োজন। গাছে পানি দেওয়ার সময় শুধুমাত্র বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে। লবণ পানি গাছের বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

ফল সংগ্রহ

ম্যাঙ্গোস্টিন ফলের পরিপক্ক হতে ৫-৬ মাস সময় লাগে, যখন পেরিকার্পস বেগুনি হয় তখন ফসল তোলা হয়।

ফলন

ম্যাঙ্গোস্টিন গাছ ৬ বছরের কম সময়ের মধ্যে ফল ধারণ করতে পারে, তবে জলবায়ু এবং চাষ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ১২ বা তার বেশি বছর লাগতে পারে। জলবায়ু এবং গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে ম্যাঙ্গোস্টিনের ফলন পরিবর্তনশীল। কচি গাছ যদি প্রথমবার ধারণ করে, তাহলে ২০০-৩০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে, যেখানে পরিপক্কতার সময় প্রতি মৌসুমে গড়ে ৫০০টি ফল পাওয়া যায়। ৩০ থেকে ৪৫ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ৩,০০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে।



রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

পাতা ভক্ষণকারী পোকাঃ এই পোকার লার্ভা স্টেজ কচি পাতা এবং অঙ্কুর খায়। আক্রমণ বেশি হলে উদ্ভিদ পাতা শুন্য হয়ে যাবে। যে কোন ধরনের কীটনাশক স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

লিফ মাইনারঃ এই পোকার লার্ভা স্টেজ কচি পাতা এবং অঙ্কুর এরএপিডার্মিসে টানেল তৈরি করে। জৈবিক এজেন্ট ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়, কিন্তু ক্ষতি হলেকীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকাঃ লার্ভা স্টেজ কচি ফল আক্রমণ করে। ফলের মেসোকার্প, আরিল এবং বীজ খেয়ে ফেলে। মাটিতে এপ্রকার প্রাপ্তবয়স্ক বিটল থাকে, তাই বিতলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে গাছে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে ।

কান্ড ক্যানকারঃ রোগটি শাখাগুলিতে আক্রমণ করে। পাতা ঝরে পড়ে এবং গাছ পাতা শুন্য হয়ে যায়। সংক্রমিত অংশগুলি পুড়ে ফেলতে হবে। গাছ মারা ডালপালা রোগের বিস্তার ঘটায়।

সুটি মল্ডঃ পাতা শুকিয়ে যায় এবং মরে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গোলাপী হয়ে যায়। বায়ু এবং সূর্যালোক বেশি থাকলে, ডালপালা ছাঁটাই দ্বারা অনুপ্রবেশ শাখা সংক্রমণ কমাবে।

২৫. পার্সিমন ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: পারসিমন
ইংরেজি নাম: Persimmon
বৈজ্ঞানিক নাম: *Diospyros kaki L.*
Family: Ebanaceae

ভূমিকা

পার্সিমন বা কাকি বর্তমানে বাংলাদেশের নাটোরে চাষ হচ্ছে যা মূলত জাপানের জাতীয় ফল। নাটোরে অল্প পরিসরে পার্সিমনের চাষ হচ্ছে। পার্সিমন প্রধানত এশিয়া মহাদেশর ফল। জাপানে এর নাম Hoshigaki, চীনে Sqibing, কোরিয়ায় Gotgam কিংবা Hangul এবং ভিয়েতনামে Hong kho নামে পিরচিত। সুস্বাদু, সুমিষ্ট, সুদৃশ্য এবং লোভনীয় একটি ফল। ফ্রিজে রেখে খেলে এর মিষ্টতা আরও বেড়ে যায়। ফলটি দেখতে আমাদের দেশের পাকা গাবের মতো। কোনটা আবার পাকা টমেটোর মতো হয়ে থাকে। অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুমিষ্ট এ ফলটি পাকলে সবুজাভ হলুদ রঙ ধারণ করে। প্রজাতিভেদে হলুদ, কমলা, লাল, বাদামী এমনকি কালচে রঙের পার্সিমনও দেখা যায়। পার্সিমন একটি চির সবুজ গাছ। প্রজাতিভেদে এ গাছের উচ্চতা ১৫ থেক ৫০ ফুট পর্যন্ত হয়। সাধারণত পাকাফলের পাতলা খোসা ছুরি দিয় ছাড়িয়ে নিয়ে ভিতরের শাঁস স্লাইস করে সরাসরি খাওয়া হয়। কোনো কোনো দেশে রান্না করে বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করেও খাওয়া হয়। এছাড়া পাকা কিংবা আধা পাকা ফল শুকিয়ে টিনজাত করে রাখা হয়। জাপানে এ গাছের পাতার রস জ্বাল দিয় চায়ের মতো পান করা হয়, যার নাম kaki no ha chu, এর ফল থেকে ভিনেগারও প্রস্তুত করা হয়।

ঔষধিগুণ

কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শ রোগ প্রতিরাধে পার্সিমন ফল খাওয়া হয়। রান্না করা ফল ডায়িরয়াও আমাশয় রোগে ব্যবহার করা হয়। মাদকাসক্ত রোগীর চিকৎসায় এফল ব্যবহার করা হয়। হুপিং কাশি রোগের প্রিতরাধে এবং সাপের কামেড়র প্রিতষধক হিসব এ ফল ব্যবহার করা হয়। ব্যাকেটরয়াজিনত বিষাক্ততার বিরুদ্ধেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। গর্ভবতী এবং যে মা বুকের দুধ খাওয়ান তাদের জন্য পার্সিমন দরকারি ফল। শরীরে ত্বকের লাবণ্যতা দেয়। পার্সিমন খেলে উচ্চ রক্ত চাপের উপশম হয়।পার্সিমন দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করে। পার্সিমনে বিদ্যমান ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস-আলসার, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ এবং বার্ধক্য প্রতিরোধে সহায়তা করে। এছাড়াও আমাদেরকে সর্দি-কাশি রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। টেনশন এবং নার্ভাসনেস কমাতে পার্সিমন ভালো কাজ করে।

পুষ্টিগুণ

পার্সিমন উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ একটি ফল। প্রজাতিভেদ শর্করার পরিমাণ থাকে ১৯-৩৩%, হজমযোগ্য আঁশ থাকে ৪% এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকা এটি অনেক ধরনের রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময় সহায়তা করে। ১০০ গ্রাম তাজা পার্সিমনে বিদ্যমান বিটা ক্যারোটিন ৮৩৪ মাইক্রো গ্রাম, থায়ামিন ০.০৩ গ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.০২ গ্রাম, নায়াসিন ০.১ গ্রাম, ভিটামিন-ই ০.১ গ্রাম, ফলেট ৮ মাইক্রো গ্রাম, কোলিন ৭.৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৮ গ্রাম, লৌহ ০.১৫ গ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ৯ গ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ ০.৩৫৫ গ্রাম, ফসফরাস ১৭ গ্রাম, পটাসিয়াম ১৬১ গ্রাম, সোডিয়াম ১ গ্রাম, জিংক ০.১১ গ্রাম।

জাত

সমগ্র পৃথিবীতে ৭৫০ প্রজাতির পার্সিমন উৎপাদিত হয়। অধিকাংশই বীজশূণ্য। এতে কিছু প্রজাতিরয়েছে যেগুলো বীজযুক্ত। কিছু প্রজাতির শাঁস আঁশ বিহীন আবার কিছু আছে আঁশযুক্ত। পার্সিমেনর উন্নত জাতগুলো হেলা- Diospyros kaki (জাপানিজ), Diospyros virginiana (আমেরিকান), Diospyros digyna (কালো রঙ-মেক্সকান), Diospyros peregrine (ইন্ডিয়ান) ইত্যাদি। আমাদের দেশের কোন জাত নেই। তবে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় বিদেশী জাতগুলোচাষ করা সম্ভব।

জন্মস্থান/উৎস

পার্সিমন চীনের স্থানীয়, যেখানে এটি রয়েছে শতাব্দী ধরে চাষ করা হয়েছে। এটি কোরিয়া এবং জাপানে এবং পরে ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স, ইতালি এবং আলজেরিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল।

মাটি

পার্সিমন বিভিন্ন ধরণের মাটিতে জন্মাতে পারে কিন্তু ভাল-নিষ্কাশিত দোআঁশমাটিতে ভাল হয়। জলাবদ্ধতা এড়ানো উচিত। মাটির pH ৬.৫ থেকে ৭.০ এর মধ্যে হলে ভাল। পার্সিমন স্যাঁতসেঁতে মাটির অবস্থা সহ্য করতে পারে। মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধির জন্য মাটিতে সবুজ সার ফসল বা ভাল কম্পোস্ট সার দেওয়া যেতে পারে।

জলবায়ু

পার্সিমন বিস্তৃত পরিসর জলবায়ুতে চাষ করা যায়। উপকূলীয় অঞ্চলগুলির হালকা থেকে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর এলাকায় জন্মে। জাপানি গবেষণায় দেখা গেছে যে ফলের আকার, রঙ এবং জাতগুলির গুণমান উন্নত হয় যেখানে গড় তাপমাত্রার থাকে ১৬°C এবং ২২°C।

গর্ত তৈরিঃ ৬০ সেমি ৬০ সেমি ৬০ সেমি মাপের গর্ত তৈরি করে নিতে হবে।
গাছ থেকে গাছের দূরত্বঃ ৬ মিটার
সারি থেকে সারির দূরত্বঃ ৬ মিটার
গর্তে সার প্রয়োগঃ গর্তে শুধুমাত্র গোবর ১০ কেজি প্রয়োগ করা যেতে পারে। রোপণের সময় সার দেবেন না। তরুণ পার্সিমন গাছ সারের প্রতি খুব সংবেদনশীল।
চারা রোপণঃ গর্ত তৈরির ১৫ দিন পর বিকালের দিকে চারা গাছ লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পর কয়েক দিন নিয়মিত পানি দিতে হবে।

বাড়ন্ত গাছে সার প্রয়োগঃ

কয়েক বছর পর, যদি পরিপক্ক পাতাগুলি গভীর সবুজ না হয় এবং অঙ্কুর বৃদ্ধি বছরে এক ফুটের কম হয়, তাহলে শীতের শেষের দিকে বা বসন্তের শুরুতে একটি সুষম সার যেমন ১০-১০-১০ প্রয়োগ করতে হবে। বছরে ৩ বার সার যথা-ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে, মে মাসের শেষের দিকে এবং জুলাইয়ের শেষের দিকে/আগস্টের শুরুতেদিতে হবে। মনে রাখবেন যে Persimmons সঙ্গে, অত্যধিক fertilizing অকালে ফল ঝরা হতে পারে রাসায়নিক বা জৈব, আপনি যা বেছে নিন তা নিশ্চিত করুন যে এতে আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, মলিবডেনাম, তামা এবং বোরন রয়েছে। এই উপাদানগুলি গাছের বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১ বছরের জন্য ৬ কাপ, ২ বছরের জন্য ১০ কাপ (৪-৬ ফুট) ৭-৯ ফুট গাছের জন্য ১৮ কাপ সার প্রয়োগ করতে হবে।



পার্সিমন গাছের জন্য সেচ

প্রথম বছর নতুন পার্সিমনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে, গাছটিকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়, যার অর্থ উদ্ভিদকে পানি দেওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হালকা/বেলে মাটিতে সপ্তাহে ২ বার পানি, কিন্তু কাদামাটি মাটিতে সপ্তাহে ১ বার পানি দিতে হবে। অতিরিক্ত পানিদেওয়া ক্ষতিকারক হতে পারে। একবার গাছটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এটি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে এক ইঞ্চি জল গ্রহণ করা উচিত। প্রথম বছরের পরে আপনাকে এতটা সজাগ থাকতে হবে না যে গাছটি তার মূল সিস্টেম স্থাপন করবে। একটি নিয়মানুযায়ী যে সময়কালে ফলের গাছের জন্য সবচেয়ে বেশি পানির প্রয়োজন হয় তা ফুলের সময়কালের ঠিক আগে, সময় এবং ঠিক পরে (মোট প্রায় ৬ সপ্তাহ) এবং ফসল কাটা পর্যন্ত। পানির অভাবে ফল অকালে ঝরে যেতে পারে তাই শুকনো সময় ভালোভাবে সেচ না ক্ষতিকর।

আগাছা দমন

পার্সিমনের চারপাশে কমপক্ষে ৪ ফুট ঘাস এবং আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে।

পার্সিমন গাছ ছাঁটাইঃ

যদিও আপনি অল্প বয়সে কেন্দ্রীয় ডাল ছাঁটাই করতে পারেন, তবে বয়স্ক ক্রমবর্ধমান পার্সিমনগুলির সাথে খুব কম ছাঁটাই প্রয়োজন যতক্ষণ না তারা ফল ধরে এবং সংশোধনমূলক ছাঁটাই প্রয়োজন হয়না। সংশোধনমূলক ছাঁটাই হল ভাঙা, হস্তক্ষেপকারী, মৃত বা অসুস্থ শাখাগুলি অপসারণ করা। ছাঁটাই করার সর্বোত্তম সময় শীতের শেষের দিকে বা বসন্তের শুরুতে, যখন গাছটি সুপ্ত থাকে। গঠন উন্নত করতে এবং বিকল্প ভারবহনের সম্ভাবনা কমাতে বছরে একবার ছাঁটাই করুন। অন্যান্য সমস্ত শাখাকে ১/৩ করে একটি কুঁড়িতে ছেঁটে দিন যা আপনি গাছটি যে দিকে বাড়তে চান তার দিকে মুখ করে থাকে।

ইয়ং পার্সিমন ট্রি (১ থেকে ৫ বছর বয়সী): একটি শক্তিশালী প্রধান শাখা গঠনকে উতসাহিত করতে, গাছটি প্রায় ৫ বছর বয়সী না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর পাতলা নতুন অঙ্কুর/শাখা ফেলুন। এমনভাবে ছাঁটাই করুন যাতে প্রধান শাখাগুলি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং একে অপরকে অতিক্রম না করে। গাছের মধ্যে সূর্যালোকের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য তাদের মধ্যে প্রায় এক ফুট জায়গা রেখে শাখাগুলি ছাঁটাই করতে হবে।

পুরানো পার্সিমন গাছ (৫ বছরের বেশি বয়সী): প্রতি বছর গাছটি হালকাভাবে ছাঁটাই করতে হবে বা মৃত কাঠ, দুর্বল শাখা, কান্ডের গোড়া থেকে চুষে যাওয়া বৃদ্ধি, মূল কান্ড থেকে অনুভূমিক অঙ্কুর বৃদ্ধি এবং যে কোনও শাখা অতিক্রম করে। একটি ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত শাখা অপসারণ করার সময়, মূল শাখার নিচে, অথবা প্রয়োজনে বা ইচ্ছামতো মূল ট্রাঙ্কের নিচে কেটে দিতে হবে।

টিপ: ছোট শাখা এবং ডালপালা হ্যান্ড প্রুনিং দিয়ে কাটা যেতে পারে তবে, ১-ইঞ্চি ব্যাসের বড় শাখাগুলিকে কেটে দেওয়ার সময়, ছাল ছিঁড়ে পরিষ্কার না করে পরিষ্কার করার জন্য ধারালো চাকু ব্যবহার করতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ফল ভালভাবে বৈশিষ্ট্যগত রঙধারণ এবং ভাল গন্ধ হলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। অপরিপক্ক ফল সমানভাবে নরম হয় না এবং স্বাদের অভাব হয়। পার্সিমন সংগ্রহের সর্বোত্তম উপায় হলসিকেচার দিয়ে ফলের সাথে কিছু বোটা রাখতে হবে।



২৬. লোকোয়াট চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: লোকোয়াট
ইংরেজি নাম: Loquat
বৈজ্ঞানিক নাম: *Eriobotrya japonica*

ভূমিকা

লোকোয়াট হল একটি বৃহৎ চিরহরিৎ ঝোপ বা গাছ যা বাণিজ্যিকভাবে এর কমলা ফল এবং এর পাতার জন্য উত্থিত হয়, যা ভেষজ চা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি শোভাময় উদ্ভিদ হিসাবেও চাষ করা হয়। লোকোয়াট Rosaceae পরিবারে রয়েছে এবং দক্ষিণ-মধ্য চীনের শীতল পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসী। জাপানে, লোকোয়াট ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জন্মেছে। এটি সারা বিশ্বে উপক্রান্তীয় থেকে মৃদু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সহ অঞ্চলগুলিতে চালু করা হয়েছে।

ঔষধিগুণ

এটি বমি ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ওষুধ। পাউডারযুক্ত লোকোয়াট পাতা ডায়রিয়া, বিষণ্নতা এবং এমনকি অ্যালকোহলযুক্ত নেশা প্রতিরোধে সহায়তা করতেও ব্যবহৃত হয়।

পুষ্টিগুণ

লোকোয়াটে উচ্চ চিনি, অ্যাসিড, এবং পেকটিন বিষয়বস্তু আছে। এটি একটি তাজা ফল হিসাবে খাওয়া হয়। ফলটি সাধারণত জ্যাম, জেলি এবং চাটনি তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় এবং প্রায়শই হালকা সিরাপ দিয়ে পরিবেশন করা হয়। লোকোয়াটে সোডিয়াম কম এবং ভিটামিন এ, ভিটামিন বি৬, খাদ্যতালিকাগত ফাইবার, পটাসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ বেশি। বেশিরভাগ সম্পর্কিত উদ্ভিদের মতো, গাছের বীজ এবং কচি পাতাগুলি সামান্য বিষাক্ত, এতে অল্প পরিমাণে সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইড থাকে যা হজম হওয়ার সময় সায়ানাইড নির্গত করে, যদিও কম ঘনত্ব এবং তিক্ত গন্ধ সাধারণত পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া হতে বাধা দেয়।

জন্মস্থান/উৎস

উদ্ভিদটি মূলত চীন থেকে এসেছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রজাতি বন্য অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায়। এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সেখানে চাষ হচ্ছে। এটি জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, বারমুডা, চিলি, কেনিয়া, লেবানন, ভারত, ইরান, ইরাক, জর্ডান, দক্ষিণ আফ্রিকা, সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা, পাকিস্থান, নিউজিল্যান্ড, রিইউনিয়ন, টোঙ্গা, সেন্ট্রাল-এ প্রাকৃতিক হয়ে উঠেছে।

মাটি

৬.০ থেকে ৭.০ এর pH সহ উর্বর এবং ভাল নিষ্কাশন। এরা বালুকাময় দোআঁশ থেকে কাদামাটি পর্যন্ত বিভিন্ন মাটিতে ভাল জন্মে। ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে গড় তাপমাত্রায় ফুল এবং ফলের বিকাশের চক্র শীতকালে প্রসারিত হয়। গাছটি দেহাতি কিন্তু বাতাস ও তুষারপাতের ফলে ফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে; -২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা ফুল এবং ছোট ফলের ক্ষতি করে।

বংশবিস্তার

গুটি কলম বংশবৃদ্ধির সবচেয়ে সফল পদ্ধতি। ৩% NAA বা ওইঅ ২৫০০ ppm দিয়ে পুরানো ছিদ্রযুক্ত অঙ্কুর চিকিতসা করতে হবে। মাটির পুষ্টি সমৃদ্ধ করার জন্য জমি প্রস্তুত করার সময় পর্যাপ্ত গোবর সার পরিপূরক হতে পারে।

চারা ব্যবধান

৬-৭ মিটার ব্যবধানে উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়।

বপনের গভীরতা

১ মিটার গভীর রোপণ করা হয়।

সার প্রয়োগ

ক্রমবর্ধমান ঋতুতে তিনবার ৬-৬-৬ NPK সার প্রয়োগ অবশ্যই গাছটিকে ফলদায়ক হতে সক্ষম করবে।

বয়স (বছর)	FYM (কেজি/গাছ)	ইউরিয়া	এসএসপি	এমওপি
১-২ বছর	১০-২০	১৫০-৫০০	২০০-৫০০	১৫০-৪০০
৩-৬ বছর	২৫-৪০	৬০০-৭৫০	৬০০-১২০০	৬০০-১০০০
৭-১০ বছর	৪০-৫০	৮০০-১০০০	১৫০০-২০০০	১১০০-১৫০০
১০ বছর এর উর্ধ্বে	৫০	১০০০	২০০০	১৫০০

ফার্ম ইয়ার্ড সার, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োগ করা হয় এবং ইউরিয়া ডোজ দুটি সমান ভাগে যোগ করা হয়, প্রথম ডোজ অক্টোবর মাসে এবং বাকি অর্ধেক ডোজ ফল সেটের পর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা হয়।

সেচ পদ্ধতি

ফসল তোলার সময় প্রধানত ৩-৪টি সেচের প্রয়োজন হয়। সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফল দেওয়ার জন্য, যখনই মাটির উপরের ছয় ইঞ্চি শুকিয়ে যায় তখন জল দিয়ে মূল অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

গাছের পরিচর্যা

স্বাস্থ্য এবং নান্দনিকতা বজায় রাখার জন্য যে শাখাগুলি মৃত, মারা যাচ্ছে বা অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা অপসারণ করা উচিত। গাছের কান্ডের চারপাশে কয়েক ইঞ্চি মালচ রাখা শিকড় রক্ষা করতে, আর্দ্রতা সংরক্ষণ করতে এবং আগাছার বৃদ্ধি দমন করতে সাহায্য করবে।



রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

পাতার দাগ: Entomosporium ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট এবং পাতার দাগের কারণে লোকোয়াট পাতায় ছোট ছোট লালচে দাগ পড়ে যা বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকে এবং কালো হয়ে যায় একটি হালকা, স্পোর-গঠনকারী দেহ অবশেষে প্রতিটি দাগের কেন্দ্রে গঠন করে, যা আরও রোগের বিস্তার ঘটায়। যেহেতু রোগটি জলের ছিটা দিয়ে ছড়ায়, তাই ওভারহেড সেচ কার্যকর হতে পারে। গাছ থেকে এবং মাটিতে উভয়ই সংক্রামিত পাতাগুলি সরিয়ে ফেলতে হবেএবং পিচ করতে হবে। কপার ছত্রাকনাশক স্প্রে একটি কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

স্ক্যাব: মূলত লোক্যাটে ফুসিক্ল্যাডিয়াম এরিওবোট্রিয়া ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট, স্ক্যাব গাছে সবুজ থেকে জলপাই-বাদামী দাগ হিসাবে প্রকাশ পায় যা ফল এবং পাতাকে আবৃত করে, যা ভোজ্যতা এবং নান্দনিকতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করে। হালকা তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা রোগের বিস্তারের জন্য সহায়ক, যখন শুষ্ক আবহাওয়া এটিকে ধীর করে দেয়। আক্রান্ত ফল ও পাতা ঝরে পড়লে তা তুলে ফেলতে হবে। রোগের উপযোগী আর্দ্রতা কমাতে ওভারহেড সেচ এড়িয়ে চলতে হবে এবং আন্তঃ ক্যানোপি বায়ুপ্রবাহ উন্নত করতে ছাঁটাই করতে হবে। আরও প্রতিরোধের জন্য, আবর্তিত ছত্রাকনাশকের একটি প্রোটোকল, কুঁড়ি ভাঙার পর থেকে এক মাস পাপড়ি পতিত হওয়ার পরে স্প্রে করা কার্যকর হতে পারে।



ফল সংগ্রহ

লোকোয়াট ফল গাছে কাটার আগে পুরোপুরি পাকতে হবে। যখন ফলটি সামান্য নরম এবং সম্পূর্ণ হলুদ থেকে কমলা হয় তখন ফসল কাটার সময়। প্রধানত চারা রোপণের তৃতীয় বছরে ফল ধরতে শুরু করে এবং সর্বোচ্চ ফলন ১৫ বছর থেকে শুরু হয়। ধারালো যন্ত্রের সাহায্যে ফল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হলে ফসল কাটা হয়। ফসল তোলার পর গ্রেডিং করা হয়। এটি একটি গড় ফলন দেয় ৬-৮ কুইন্টাল/একর।





২৭. লংগান ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: লংগান বা আঁশফল বা কাঠলিচু
ইংরেজি নাম: Longan
বৈজ্ঞানিক নাম: *Dimocarpus longan*

ভূমিকা

কাঠলিচু এক প্রকার লিচু জাতীয় সুস্বাদু ফল। এটি লংগান বা আঁশফল নামেও পরিচিত। কাঠলিচু গাছ মধ্যম আকারের চিরসবুজ গাছ যা ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এদের পুষ্প পুং পুষ্পক এবং উভলিঙ্গ, পুংকেশর ৮টি। কাঠলিচুর ফল ঝুলন্ত এবং আঙুরের মতো গুচ্ছাকার। যা ক্রান্তীয় অঞ্চলের বৃক্ষ। এটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্ভিদ। আঁশফল আমাদের দেশে একটি বিদেশি ফল। কাঠলিচু লিচু পরিবারভুক্ত একটি ফল। স্বাদে, গন্ধে, পুষ্টিতে লিচুর সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও ফলটি এ দেশে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে কাঠলিচু বেশ জনপ্রিয়। উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত না থাকায় ফলটি সর্বমহলে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠেনি। ফল আকারে ছোট এবং খেতে সুস্বাদু। দেশের সর্বত্রই এর চাষ সম্ভব। কাঠলিচু প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও ভিটামিন 'সি' রয়েছে।

ঔষধিগুণ

লংগান বা কাঠলিচু ফল ক্যালোরিতে কম এবং এটি একটি সুপারফুড হিসাবে বিবেচিত হয়। লংগান ফলের বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। এই ফলগুলি উদ্বেগ কমায়। এছাড়াও, এই রসাল ফলটি সংক্রমণ, ত্বকের সমস্যা, স্থূলতা, স্ট্রেস এবং উদ্বেগের চিকিৎসায় উপকারী।

পুষ্টিগুণ

ফলের ভোজ্য অংশ সমগ্র ফলের ৬৭ থেকে ৭৮ শতাংশ পর্যন্ত। শক্তির মান গড় ৪৫৮ kJ/১০০ গ্রাম। চিনির পরিমাণ খুব বেশি। আর্দ্রতা ৭২.৪%, প্রোটিন ১.০ গ্রাম, চর্বি ০.৫ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২৫.২ গ্রাম, ফাইবার ০.৪ গ্রাম, Ca ২.০ মিগ্রাম, P ৬.০ মিগ্রাম, Fe ০.৩ মিগ্রাম, Vitamin-A ২৮.০ I.U., Vitamin-C ৮.০ মিগ্রাম।

জাত

বারি আঁশফল-১: অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯৭ সালে বারি আঁশফল-১ জাতটি আমাদের দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। এটি একটি বহু বর্ষজীবী বৃক্ষ। উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল ছোট (গড় ওজন ৩.৫ গ্রাম), গোলাকার, বাদামী রঙের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং স্বাদ খুব মিষ্টি (২০-২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ যোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩-৪ টন। ফুল আসে মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) মাসে এবং মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগস্ট) মাসে ফল পাকে। জাতটি দেশের সর্বত্রই ভাল জন্মে।

বারি আঁশফল-২: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল বিভাগ বারি আঁশফল-২ নামে আঁশফলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। নিয়মিত ফলধারী জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০০৯ সালে মুক্তায়ন করা হয়। ফল গোলাকৃতির, বেশ বড় (৯ গ্রাম), শাঁস সাদা, আংশিক কচকচে, রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৫%)। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%। দেশের মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে চাষোপযোগী জাতটি ফলের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

জন্মস্থান/উৎস

লংগানের উৎস বিতর্কিত। যেখানে কিছু লেখক মায়ানমার থেকে দক্ষিণ চীনের মধ্য দিয়ে পর্বত শৃঙ্খলে লংগানের উৎপত্তির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করেছেন, অন্যরা ভূমিসহ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত ও শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। চীনে, এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে লংগানের প্রাথমিক কেন্দ্র ছিল ইউনান, এবং গৌণ কেন্দ্রগুলি ছিল গুয়াংডং, গুয়াংজি এবং হাইনান প্রদেশ।

মাটি ও জলবায়ু

কাঠলিচু চাষের জন্য দোআঁশ মাটি উত্তম। শীতল অঞ্চল এর জন্য ভাল নয়; ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের উপরে থাকে এমন অঞ্চল এর জন্য উপযুক্ত; তবে স্বল্প সময়ের জন্য তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত নেমে গেলেও এটি তা সহ্য করতে পারে। কাঠলিচু এবং লিচু গাছের ফল ধরার সময় একই।

চারা উৎপাদন

গ্রাফটিং ও গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা যায়।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৫ মিটার × ৫ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

চারা রোপণ

বাগানে রোপণের দূরত্ব ৫ মিটার × ৫ মিটার রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ৪০০টি।



সারের পরিমাণ

গুণগত মানসম্পন্ন উচচ ফলন পেতে হলে আঁশফলে নিয়মিত সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হলো।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	১৫০-২৫০	১৫০	১৫০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	১০০
৫-৬ বছর	১৫-২০	৫০০-৬০০	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০	২০০
৭-১০ বছর	২০-২৫	৭৫০-১০০০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৩০০
১১ বছর এর উর্ধ্বে	২৫-৩০	১০০০-১২০০	৭৫০-৯০০	৭৫০-৯০০	৪০০

উল্লিখিত সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম বার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুকুল আসার পর ২য় বার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজের রং ধারণ পর্যায়ে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল সংগ্রহের পর ৩য় বার সার প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগ

খরার সময় পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিবৃষ্টির সময় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

লংগান ফুল ফোটা থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত প্রায় ৫ মাস সময় নেয়। ফল পাকলেই সংগ্রহ করতে হয়। পরিপক্কতা ফলের আকৃতি, ত্বকের রঙ এবং স্বাদ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অপরিপক্ক ফল স্বাদহীন। লংগান গাছ ৭-১০ দিনের ব্যবধানে দুবার বাছাই করা উচিত। ফল পরিপক্ক হলে ফসল কাটাতে দেরি হলে অধিকাংশ জাতই স্বাদ হারায়। এক বা দুটি পাতাযুক্ত ফলের পুরো প্যানিকেল একটি ছুরি বা কাঁচি দিয়ে কাটা হয়। ফসল কাটার সময় ফলের প্যানিকেলসহ অত্যধিক পাতা এবং কাঠ অপসারণ করলে পরবর্তী মৌসুমে ফুলের পরিমাণ কমে যায়



২৮. স্ট্রবেরির চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: স্ট্রবেরি
ইংরেজি নাম: Strawberry
বৈজ্ঞানিক নাম: *Fragaria ananassa*

ভূমিকা

স্ট্রবেরি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। মৃদু শীত প্রধান দেশে এটি স্বল্প মেয়াদী ফল হিসেবে চাষ হয়। আকর্ষণীয় রং, গন্ধ ও উচচ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত সমাদৃত। এতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। ফল হিসেবে সরাসরি খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ বৃদ্ধিতেও স্ট্রবেরি ব্যবহৃত হয়।

ঔষধিগুণ

স্ট্রবেরি হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের শীর্ষ উৎস, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করতে পারে। স্ট্রবেরি কার্ডিওমেটাবলিক ঝুঁকি কমাতে পারে। স্ট্রবেরি Cognitive ক্রিয়াকে সমর্থন করতে পারে এবং ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে পারে। স্ট্রবেরি কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত করতে পারে। ফ্ল্যাভোনয়েড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি, বিশেষ করে নির্দিষ্ট ফলের ক্ষেত্রে প্রদাহের চিহ্নগুলিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধে নিউরোপ্রোটেক্টিভ, অ্যান্টিক্যান্সার, কার্ডিওপ্রোটেক্টিভ এবং অ্যান্টি-ডায়াবেটিস বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। স্ট্রবেরিতে প্রিবায়োটিক ক্রিয়াকলাপ থাকতে পারে, যা অন্ত্রের জন্য উপকারী।

পুষ্টিগুণ

৩.৫ আউন্স (১০০ গ্রাম) কাঁচা স্ট্রবেরিতে (৩টি) পুষ্টি উপাদানগুলি হল: ক্যালোরি: ৩২, পানি: ৯১%, প্রোটিন: ০.৭ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট: ৭.৭ গ্রাম, চিনি: ৪.৯ গ্রাম, ফাইবার: ২ গ্রাম, চর্বি: ০.৩ গ্রাম।

জাত

বারি স্ট্রবেরি-১: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি স্ট্রবেরি-১ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটি ২০০৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৩০ সেমি এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সেমি। নভেম্বরের মাঝামাঝী সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ প্রতি গড়ে ৩২টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন। হৃৎপিণ্ডাকৃতির ফল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকারের যার গড় ওজন ১৪ গ্রাম। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-২: বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একাট উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছপ্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৪১ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল দেখতে আকর্ষণীয় গাঢ় লাল রঙের, তুলনামূলক দৃঢ়, আকারে বেশ বড়, প্রান্তভাগ চ্যাপ্টা, রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস ৮%)। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি' বিদ্যমান (৭৬ মিগ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরুলতা (রানার) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-৩: বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ প্রতি গড়ে ৩৯টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৭০ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। ফল দেখতে আকর্ষণীয় লাল রঙের, লম্বা মোচাকৃতি, আকারে বেশ বড়, ফল তুলানামূলক দৃঢ়, প্রান্তভাগ সরু, রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি' বিদ্যমান (৭২ মিগ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা (রানার) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

জন্মস্থান/উৎস: স্ট্রবেরি ১৮ শতকে ইউরোপে উদ্ভূত হয়েছিল। স্ট্রবেরি উদ্ভিদটি ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার স্থানীয়। প্রাচীন রোমান এবং গ্রীকরা উদ্ভিদটির প্রথম চাষ করেছিল।

মাটি

মাটি ও আবহাওয়া: স্ট্রবেরি মূলত মৃদু শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিন্তু গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা তাপ সহিষ্ণু। দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬০ ও ১২-১৬০ সে. তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাতসমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম স্ট্রবেরি চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের উর্বর দোআঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

বংশ বিস্তার

রানার থেকে স্ট্রবেরি বংশ বিস্তার: স্বাস্থ্যকর, সেরা স্বাদের রানার নির্বাচন করে মূলে থাকা রানার আলতো করে খনন করে, মূল উদ্ভিদ থেকে তাদের সংযোগ কেটে এবং ১০-১৫ সেমি ব্যাসের ছোট পাত্রে রাখা হয়। যদি রানার এখনও নিজস্ব রুট না করে থাকে, তাহলে ছোট পাত্রগুলিকে আংশিকভাবে মাটিতে পুঁতে দিয়ে সেগুলিকে মিডিয়া দিয়ে পূর্ণ করে রানার জুড়ে রাখতে হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে শিকড় হওয়ার পরে, এই নতুন গাছগুলিকে মূল উদ্ভিদ থেকে ছিন্ন করা হয় এবং নতুন গাছপালা আগস্ট জুড়ে রোপণ করা যেতে পারে। ঠান্ডা আবহাওয়া থেকে কোন ক্ষতি এড়াতে, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে রোপণ করা যেতে পারে।

চারা উৎপাদন

স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ হতে উৎপন্ন রানারে যখন শিকড় বের হবে তখন তা কেটে ৫০ ভাগ গোবর ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত হতে চারাকে রক্ষার জন্য বৃষ্টির মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।





Rwg ^Zwi I Pviv †ivcY

স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০-৬০ সেমি দূরত্বে দুই সারিতে ৩০-৪০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

mvi cÖ‡qvM

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

mv‡ii bvg	†hŠ±i cÖwZ cwigvY
cPv †Mvei	৩০ (টন)
ইউরিয়া	২৫০ (কেজি)
wUGmwc	২০০ (কেজি)
Gglwc	২০০ (কেজি)
wRcmvg	১৫০ (কেজি)

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

†mP I wb®‹vkb

জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে প্রয়োজন মতো পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

AšÍe¨Z©K©‡K vj xb cwiPh©

সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরির বেড খড় বা কাল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উঁই পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৩মিলি ডার্সবান-২০ ইসি ও ২ গ্রাম অটোস্টিন ডিএফ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে খড় শোধন করে নিলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণ হয় না এবং দীর্ঘ দিন তা অবিকৃত থাকে। জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। উক্ত রানারসমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের উৎপাদন হ্রাস পায়।

gvZ.MÖQi ÿ Yv‡eÿ Y

স্ট্রবেরি গাছ প্রখর সৌর-তাপ এবং ভারী বর্ষণ সহ্য করতে পারে না। এজন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ফল আহরণের পর মাতৃ গাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃগাছকে খরতাপ ও ভারী বর্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়। মাতৃগাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তী সময়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

†i vMeyj vB I `gb e¨vemv‡`i cbv

cvZvq `vM cov †ivcvB: কোন সময় ছত্রাকজনিত রোগের পাতায় বাদামী রঙের দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে ফলন এবং ফলের গুণগত মান হ্রাস পায়।

cÖwZKvi: সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

dj cPv †ivMvB: রোগের আক্রমণে ফলের গায়ে জলে ভেজা বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার: ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে নোইন ৫০ ডব্লিওপি অথবা অটোস্টিন নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ভারটিসিলাম উইল্ট রোগ: এ রোগে আক্রান্ত গাছ হঠাৎ করে দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং মারা যায়। সাধারণত জলাবদ্ধতাসম্পন্ন জমিতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার: জমি শুষ্ক রাখতে হবে। পলিথিন মাল্চ ব্যবহার করলে তা তুলে ফেলতে হবে। কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- বর্দোমিক্সর (১ঃ১ঃ১০) ৮-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছের গোড়া ও মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পাখি: বুলবুলি পাখি স্ট্রবেরির সব চেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাখির উপদ্রব শুরু হয়।

প্রতিকার: ফল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে।

ভাইরাস: ভাইরাস রোগের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা এবং গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। সাদা মাছি এ ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার: এডমায়ার ২০০ এসএল নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে সাদা মাছি দমন করলে ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

মাইট: মাইটের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ও গুণগত মান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এদের আক্রমণে পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে ও পুরু হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে কুচকে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

প্রতিকার: ভারটিমেক ১৮ ইসি নামক মাকড়নাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝী (অক্টোবরের শুরু) সময়ে রোপণকৃত বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়।

ফল সংরক্ষণ

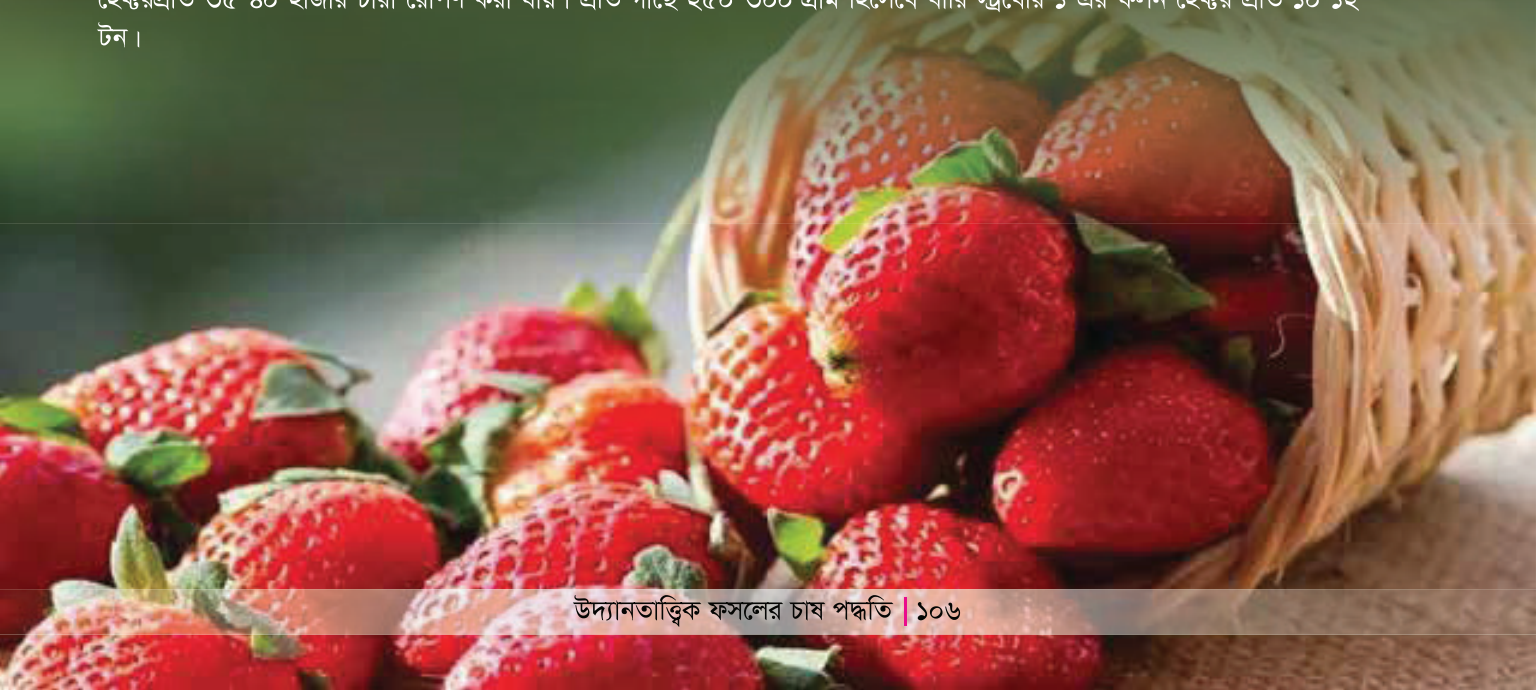
স্ট্রবেরির সংরক্ষণ কাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পরই তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে।

ফল বাজারজাতকরণ কৌশল

ফল সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহন সহিষ্ণুতা কম হওয়ায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এর চাষ করা উত্তম।

ফলন

হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ হাজার চারা রোপণ করা যায়। প্রতি গাছে ২৫০-৩০০ গ্রাম হিসেবে বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফলন হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন।



২৯. প্যাশন ফলের চাষ পদ্ধতি





বাংলানাম: প্যাশন ফল
ইংরেজি নাম: Passion fruit
বৈজ্ঞানিক নাম: Passiflora edulis
গোত্র: Passifloraceae

ভূমিকা

প্যাশন ফল বাংলাদেশে একটি অপ্রচলিত পরিচিত ফল। অনেকের কাছে এটি ট্যাং ফল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চল, সিলেট, টাঙ্গাইল এবং রাজশাহী অঞ্চলে ইহা কম বেশি দেখা যায়। ঝুমকো লতার সমগোত্রীয় প্যাশন ফলের গাছ দীর্ঘ প্রসারী এবং বহুবর্ষজীবী। ফলের ভিতর গাত্রে অসংখ্য হলুদাভ, রসপূর্ণ থলে (Juice sac) থাকে, এগুলি ভক্ষণযোগ্য অংশ। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়ার চেয়ে প্যাশন ফলের তৈরি শরবত বেশি উপাদেয়।

ঔষধিগুণ

এই ফলটির প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। প্যাশন ফলটিতে খুব উচ্চ পরিমাণে ফাইবার থাকে তাই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে সমাধান করবে। প্যাশন ফল ভিটামিন এবং খনিজগুলির একটি দুর্দান্ত উৎস যা শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয়। শেষ পর্যন্ত, একটি চেইন প্রতিক্রিয়া সঞ্চালিত হয় যেখানে এই সমস্ত পুষ্টিগুলি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি এই ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এবং ভিটামিন এ এর সাথে একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হওয়ায় তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পরিচালনা করে, তাই আমরা প্রতিনিয়ত সুস্থ থাকব, এইভাবে সম্ভাব্য সর্দি এবং ভাইরাস এড়ানো সম্ভব। প্যাশন ফলের বীজে একটি অপরিহার্য তেল রয়েছে যা ত্বক এবং চুলের যত্নে সাহায্য করে। উপরন্তু, ফলের প্রদাহ বিরোধী বৈশিষ্ট্য ত্বক এবং মাথার ত্বকে কাজ করে, কোষগুলিকে রক্ষা করে এবং হাইড্রেটিং করে। এই ফলের সাইট্রিক প্রকৃতি তৈলাক্ত ত্বক এবং খুশকি এড়ানো, লোমকূপের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং প্রাকৃতিকভাবে চকচকে করে চুল বৃদ্ধি করে।

পুষ্টিগুণ

প্যাশন ফলের কিছু খুব আকর্ষণীয় পুষ্টিগুণ রয়েছে যা আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীতা মিটাতে সাহায্য করে। প্রতি ১০০ গ্রাম প্যাশন ফল রয়েছে শক্তি ৯৭ কিলোক্যালরী, কার্বোহাইড্রেট ২৩.৪ গ্রাম, চিনি ১১.২ গ্রাম, ফাইবার ১০.৪ গ্রাম, চর্বি ০.৭ গ্রাম, প্রোটিন ২.২ গ্রাম, বিটা-ক্যারোটিন ৬৪মাইক্রো গ্রাম, রিবোফ্লাভিন ০.১৩ মিগ্রা, নিয়াসিন ১.৫ মিগ্রা, ভিটামিন বি৬ ০.১ মিলিগ্রাম, ফোলেট ১৪ মাইক্রো গ্রাম, কোলিন ৭.৬ মিগ্রা, ভিটামিন সি ৩০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন কে ০.৭ মাইক্রো গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.৬ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ২৯ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৬৮ মিগ্রা, পটাসিয়াম ৩৪৮ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ২৮ মিলিগ্রাম, জিঙ্ক ০.১ মিগ্রা, জল ৭২.৯ গ্রাম।

জাত

প্যাশন ফলের জাত বারি প্যাশন ফল-১: বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন শেষে 'বারি প্যাশন ফল-১' নামে জাতটি ২০০৩ সালে মুক্তায়ন করা হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। পাকা ফল দেখতে হলুদ রঙের এবং গাত্র খুবই মসৃণ। ফলের গড় ওজন ৬৮ গ্রাম এবং প্রতি ফল থেকে ৩০ গ্রাম জুস আহরণ করা যায়। এ জাতটি পার্বত্য জেলাসমূহে চাষাবাদের উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ৫-৬ টন।

জন্মস্থান/উৎস

প্যাশন ফল দক্ষিণ আমেরিকা এবং আরও নির্দিষ্টভাবে ব্রাজিলের (উত্তর আর্জেন্টিনা এবং ইকুয়েডর) স্থানীয়। উদ্ভিদটি ১৯ শতকে বিশ্বের অন্যান্য অংশে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং ভারত ও হাওয়াইতে স্থানীয় এবং ব্যাপকভাবে জন্মায়। দক্ষিণ আমেরিকা এখনও প্যাশন ফলের সবচেয়ে বড় উৎপাদক, যেখানে ব্রাজিল, মেক্সিকো এবং ইকুয়েডর শীর্ষ ৩ দেশ।

জলবায়ু ও মাটি

সাধারণভাবে প্যাশন ফলকে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। অধিক উষ্ণতা ও শৈত্য কোনটাই এ ফলের জন্য ভাল নয়। বৃষ্টিপাত ফুলের পরাগায়ণে বিলম্বনা সৃষ্টি করে। যে কোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে প্যাশন ফলের চাষ করা যায়। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। প্যাশন ফল জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মাটির ক্ষারত্ব (pH) ৫.৫-৭.৫ উত্তম। ক্ষারত্ব ৫.৫ এর নিচে হলে চুন প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। প্যাশন ফল লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।



বংশবিস্তার

বীজ দ্বারা সহজেই প্যাশন ফলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তনের মাধ্যমে প্যাশন ফলের অঙ্গজ বংশ বিস্তার করা যায়। এক থেকে দেড় বছর বয়সী শাখা নির্বাচন করে তা থেকে ২০-৩০ সেমি লম্বা করে কেটে একেকটি শাখা কলম তৈরি করা হয় যাতে অন্তত ২-৩টি পর্বসন্ধি (নোড) থাকে। কাটিং এর নিচের পর্ব হতে ১-২ সেমি নিচে তেরসা কাট দিয়ে এর নিচের পর্বসহ একেকটি কাটিং পলিব্যাগের মাটিতে পুঁতে চারা তৈরি করা হয়। কাটিং দ্বারা চারা তৈরির উপযুক্ত সময় হচ্ছে জুন-আগস্ট মাস।

জমি তৈরি

সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না প্যাশন ফলের জন্য এরকম জমি উত্তম। জমি গভীর-ভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়।

গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ

চারা রোপণ করার জন্য ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি সার মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

চারা লাগানোর সময়

জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছর চারা লাগানো যায়।

সারি থেকে সারির দূরত্ব: ৪ মিটার
চারা থেকে চারার দূরত্ব: ৪ মিটার

চারা/কলম এর পরিচর্যা

বাণিজ্যিকভাবে প্যাশন ফল সারি করে লাগাতে হয়।মাদা তৈরির ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম গর্তের ঠিক মাঝখানে লাগাতে হয়। রোপণের পর হাত দিয়ে আলতোভাবে মাটিচারার গোড়ার চারদিকে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে নাপড়ে। চারা লাগানোর পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি নিম্নলিখিত হারে সার দিতে হবে। উল্লিখিত সার সমান ৩ কিস্তিতে শীতের শেষে (ফেব্রুয়ারি), বর্ষার আগে (এপ্রিল-মে) ও বর্ষার শেষে(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) গাছের গোড়া থেকে সামান্য দূরে প্রয়োগ করে হালকা করে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবেমিশিয়ে দিতে হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬-৯ বছর	১০ বছর ও তদুর্ধ্ব ১৫
গোবর(কেজি)	৬	৮	১০	১৫
ইউরিয়া(গ্রাম)	১৫০	৩০০	৪৫০	৬০০
টিএসপি(গ্রাম)	১৫০	৩০০	৪৫০	৪৫০
এমওপি(গ্রাম)	১৫০	৩০০	৪৫০	৬০০

আগাছা দমন

গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে এক মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন

চারা রোপণের পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসাও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে প্যাশন ফলে সেচ দেওয়াপ্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছের গোড়া থেকে ১.৫- ২.০ মিটার পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা হয় না তাই এ সমস্ত ডালা সব সময় কেটে দেওয়া ভাল। যেহেতু নতুন শাখায় বেশি ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তাই প্রতি বছর নিয়মিত কিছু শাখাপ্রশাখা কেটে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পুরাতন ও মরা ডাল কেটে দিতে হয়। শীতকালই ডাল ছাঁটাইকরণের উপযুক্ত সময়।

মাচা তৈরি

লতা জাতীয় গাছ হওয়ায় প্যাশন ফলে মাচা দেয়া আবশ্যক। প্যাশন ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্যমাচা তৈরি করা হয়ে থাকে। জিআই তার দিয়ে স্থায়ীভাবে মাচা তৈরি করা যায়। তবে অস্থায়ীভাবে বাঁশ দ্বারাও মাচা তৈরি করা যায়। চারা লাগানোর পর যখন চারা বাড়তে শুরু করে অর্থাৎ ৩-৪ মাস পর মাচা তৈরি করতেহয় যাতে গাছের লতা সহজেই মাচায় উঠতে পারে। মাচার উচ্চতা ১.৫ মিটার হলে ভাল হয় যাতে সহজে ফলআহরণ করা যায় ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। প্রতি ১/২ সারিতে ১টি করে মাচা তৈরি করা যায়।

ফল সংগ্রহ

প্যাশন ফলে ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল মার্চ মাস এবং তা থেকে জুলাই-আগস্ট মাসে ফল আহরণকরা হয়। আবার অনেক সময় আগস্ট মাসেও কিছু ফুল আসে তা থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল আহরণ করাযায়।

রোগবালাই ও দমনব্যাবস্থাপনা

মাছি পোকা দমন: ফলের মাছি পোকা বা ফ্রুট ফ্লাই অনেক সময় কচি ফলের গায়ে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং তাতেফল কুচকে যায় ও অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে পড়ে।

দমন: সেক্স ফেরোমন ফাদ ব্যবহার করে মাছি পোকা সাফল্যজনক ভাবে দমন করা যায়।

৩৪. রাম্বুতান চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: রাম্বুতান
ইংরেজি নাম: Rambutan
বৈজ্ঞানিক নাম: *Nephelium lappaceum*

ভূমিকা

রাম্বুতান আকর্ষণীয়, অত্যন্ত সুস্বাদু ও রসালো ফল। সাদা, স্বচ্ছ, মিষ্টি স্বাদ ও গন্ধযুক্ত শাঁস এ ফলের ভক্ষণীয় অংশ। গায়ে লাল ও নরম কাঁটা থাকার কারণে এদের লিচু থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহ (যেখানে শীতের প্রকোপ তুলনামূলক ভাবে কম) রাম্বুতান চাষের জন্য অধিক উপযোগী।

ঔষধিগুণ

এটি ডায়াবেটিস কমাতে পারে, রক্তচাপ কমাতে পারে এবং হজম ফাংশন বাড়াতে পারে। রাম্বুটান ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাল সংক্রমণের রোধের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উপরন্ত, রাম্বুটান এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রদাহ কমাতে পারে। এটি ডেঙ্গু এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও অধিক উপযোগী।

পুষ্টিগুণ

রাম্বুতান 'শর্করা' ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি ফল। আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে (জলীয় অংশ ৮২.১%, প্রোটিন ০.৯%, ফ্যাট ০.১%, ০.০৩% আঁশ, ০.০৫% ম্যালিক এসিড, ০.৩১% সাইট্রিক এসিড), ২.৮ গ্রাম গ্লুকোজ, ৩.০ গ্রাম ফ্রুকটোজ, ৯.৯ গ্রাম সুক্রোজ, ২.৮ গ্রাম ফাইবার, ৭০ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি, ১৫ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.১-২.৫ মিলি গ্রাম লৌহ, ১৪০ মিলি গ্রাম পটাসিয়াম, ও ১০ মিলি গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

জন্মস্থান/উৎস: মালেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেই এদের উৎপত্তিস্থল এবং দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

বারি রাম্বুতান-১: বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি ২০১০ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য বারি রাম্বুতান-১ নামে অনুমোদন দেয়া হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল ধরে। শ্রাবণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়, ফল ডিম্বাকৃতির, আকারে বড় (৫০ গ্রাম)। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় লালচে খয়েরি। ফলের গায়ের কাঁটা (স্পাইনলেট) বেশ লম্বা ও নরম। শাঁস পুরুত্ব, মাংসল, সাদা, নরম, রসালো সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (১৯%)। বীজ ছোট ও নরম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

জলবায়ু ও মাটি

রাম্বুতান উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। রাম্বুতান ফলের গাছ ২২-৩৫০ সে. তাপমাত্রা ও ২০০০ থেকে ৩০০০ মিমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত পছন্দ করে। এঁটেল দোঁআশ মাটি রাম্বুতান চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত পলিমাটি ও দোআঁশ মাটিতেও রাম্বুতান সাফল্যজনকভাবে চাষ করা যায়। সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সম্বলিত মাটিতে গাছের মূলের বৃদ্ধি ও বিকাশ ভাল হয়। মাটির অম্ল/ক্ষারত্ব (pH ৫.০-৬.৫) রাম্বুতানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। রাম্বুতান স্বল্পমেয়াদী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারলেও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়।

বংশবিস্তার

অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার উত্তম। কুঁড়ি সংযোজন ও গুটিকলম পদ্ধতিতে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা হয়। ১-২ বৎসর বয়সী শাখা থেকে সুপ্ত কুঁড়ি সংগ্রহ করে ৮-১২ মাস বয়সের রুটস্টক সংযোজন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গুটি কলম পদ্ধতিতে সফলতার হার বেশি এবং শ্রমসাধ্য। ১০০০-১৫০০ পিপিএম ঘনত্বের আইবিএ ব্যবহার করে গুটি কলমের মাধ্যমেও সফলভাবে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা যায়।

জমি তৈরি

রাম্বুতানের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ করতে হবে। কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো।

রোপণের সময়

মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি

উভয় দিকে ৮-১০ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে কলমের চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার গোড়া নড়ে না যায়। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।



সার প্রয়োগ

বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১০-১৫	২০০	২৫০	১৫০
২-৪	১৫-২০	৩০০	৪৫০	৩০০
৫-৭	২০-২৫	৪৫০	৭৫০	৪৫০
৮-১০	২৫-৩০	৭৫০	১২০০	৬০০
১০-১৫	৩০-৪০	১২০০	১৫০০	৭৫০
১৫ বছরের উর্ধ্বে	৪০-৫০	১৫০০	২০০০	১০০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ফল আহরণের পর (ভাদ্র মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি শীতের প্রারম্ভে (কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফল আসার পর (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

রাম্বুতান গাছ খরা সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মতো হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আরও একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

ডাল ও মুকুল ছাঁটাইকরণ

রাম্বুতান গাছকে সধারণত লম্বা ও খাড়াভাবে বাড়তে দেখা যায়। তাই প্রথম দিকেই গাছের সঠিকভাবে প্রুনিং করা জরুরি। ফল সংগ্রহের পরপর ফলের বোটা গোড়া থেকে কেটে দিতে হবে তাতে গাছের নতুন কুঁড়িগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। মৃত এবং রোগাক্রান্ত ডালপালাগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। কলমের ক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা কেটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ

সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রং লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজার মূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে খয়েরী বর্ণ ধারণ করার ১০-১২ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে এরিল শুকিয়ে শক্ত হয় এবং ফলের সুগন্ধ ও স্বাদ কমে যায়।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

রোগের প্রাদুর্ভাবের তীব্রতার মাত্রা কৃষি জলবায়ু অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। সাধারণ রোগগুলি হল:
পাউডার মিলডিউ, ফল পচা, অ্যানথ্রাকনোজ, স্টেম ক্যানকার, পিঙ্ক ডিজিজ, সোটি মোল্ড এবং ভেইন নেক্রোসিস।

পাউডারি মিলডিউ (Oidium nepheli): এটি রাম্বুটানের সবচেয়ে বিস্তৃত রোগ। তরুণ উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি এবং পুষ্পমঞ্জরি রোগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। টক জাতের তুলনায় মিষ্টির জাত বেশি আক্রান্ত হয়েছে। এটি বায়ুবাহিত রোগ এবং এর উপসর্গগুলি পাতা ও ফুলের উপর সাদা হলুদ ধূসর পদার্থ হিসাবে দেখা যায়। ফলের সাথে সাথে ছোট ফল ঝরে যায় কারণ কালো এবং স্তব্ধ থাকে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে সঠিক বায়ুচলাচল নিশ্চিত করার মাধ্যমে রোগটি কমিয়ে আনা যায়। সালফার, কপার অক্সিক্লোরাইড, কেরাথেনের মতো ছত্রাকনাশক সময়মত স্প্রে করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৩১. ব্লু-বেরি চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: ব্লু-বেরি
ইংরেজি নাম: Blueberry
বৈজ্ঞানিক নাম: *Vaccinium corymbosum*

ভূমিকা

ব্লু-বেরি একটি বহুবর্ষজীবী সপুষ্পক উদ্ভিদ যাতে নীল বা বেগুনী রঙের বেরি জন্মায়। এরা ভ্যাকসিনিয়াম গণের সায়ানোকক্কাস বিভাগের অন্তর্গত। ব্লু-বেরি মাটিতে জন্মানো গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ যার উচ্চতা সাধারণত ১০ সেন্টিমিটার (৩.৯ ইঞ্চি) থেকে ৪ মিটার (১৩ ফু) পর্যন্ত হতে পারে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছোট, মটর আকৃতির ও নিচু ঝোপে বেড়ে ওঠা ব্লু-বেরিকে "লোবুশ" ব্লু-বেরি ("বুনো" বা রিষফ-এর সমার্থক) আর বড় আকারের, লম্বা চাষকৃত ঝোপে জন্মানো প্রজাতিকে "হাইবুশ ব্লু-বেরি" বলা হয়। ব্লু-বেরি উদ্ভিদ চিরহরিৎ অথবা পর্ণমোচী হতে পারে। পাতা ডিম্বাকার অথবা ভলাকার, দৈর্ঘ্যে ১৮ সেমি লম্বা ও প্রস্থে ০.৫৩.৫ সেমি চওড়া হয়ে থাকে। ফল বেরি জাতীয়, ব্যাস ৫১৬ মিলিমিটার এবং শেষে মুকুটের মত অংশ থাকে। কাঁচা অবস্থায় ফলের রং ফ্যাকাশে সবুজ হলেও পরে লালচে-বেগুনি ও পাকার পর গাঢ় বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। ফলের গায়ে পাতলা মোমের আস্তরণ থাকে। পাকার পরে ফলের স্বাদ মিষ্টি হয়, তবে অম্লত্বের পার্থক্য থাকতে পারে।

ব্যবহার

ব্লু-বেরি তাজা ফল অথবা স্বতন্ত্রভাবে হিমায়িত ফল, পিউরি, জুস অথবা শুকিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রি করা হয়। তারপর এগুলো বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্য যেমন, জেলি, জ্যাম, ব্লু-বেরি পাই, মাফিন, হালকা জলখাবার অথবা ব্রেকাফাস্ট সিরিয়ালের সংযোজন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্লু-বেরি, চিনি, পানি এবং ফলের পেক্টিন দিয়ে ব্লু-বেরি জ্যাম তৈরি হয়। ব্লু-বেরি থেকে একধরনের মিষ্টি সসতৈরি করা হয়। ব্লু-বেরির ফল ও খোসা থেকে ব্লু-বেরি ওয়াইন তৈরি হয়। এগুলো প্রথমে গাঁজানো হয় তারপর পরিপক্ব হওয়ার জন্য রেখে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে, প্রধানত লোবুশ ব্লু-বেরি ব্যবহৃত হয়।

পুষ্টিগুণ

ব্লু-বেরির উপাদান হল ১৪% শর্করা, ০.৭% প্রোটিন, ০.৩% চর্বি ও ৮৪% পানি। এতে সামান্য পরিমাণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস রয়েছেএবং মাঝারি পরিমাণে অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ যেমন-ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, খাদ্যআঁশ ইত্যাদি রয়েছে। সাধারণত, ব্লু-বেরির পুষ্টি উপাদানগুলো দৈনিক পুষ্টি চাহিদার তুলনায় কম। প্রতি ১০০গ্রাম ব্লু-বেরির থেকে ৫৭ কিলোক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়।

জন্মস্থান/উৎস

বন্য ('লোবুশ') এবং চাষ করা ('হাইবুশ') ব্লু-বেরিসহ সমস্ত বাণিজ্যিক"ব্লু-বেরি" উত্তর আমেরিকার স্থানীয় প্রজাতি। ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপে হাইবুশ ব্লু-বেরির প্রচলন ঘটে।

জলবায়ু

আর্দ্রতা অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত। ভারী ছায়া এবং সীমাবদ্ধ বায়ুচলাচল তার প্রভাব দিতে পারে।

মাটি

ব্লু-বেরির জন্য অম্লীয় মাটি প্রয়োজন, এবং সর্বোত্তম পিএইচ ৪.৮। নাইট্রোজেন এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করা হয় মাটির অম্লতা বৃদ্ধির জন্য।

বংশ বিস্তার

কাটিং এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা হয় ।

চারা রোপণ

চারা থেকে চারার দূরত্ব ১.২ - ১.৫ মিটার এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩ মিটার।

সার প্রয়োগ

ব্লু-বেরির জন্য নিম্নলিখিত হারে (কেজি/হেক্টর) সার মে - সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োগ করা যেতে পারে -৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ২৫ কেজি P2O5 ও ১০০ কেজি K2O

সেচ পদ্ধতি

ব্লু-বেরিগাছের জন্য প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে এক ইঞ্চি পানি প্রয়োজন (৬৫ গ্যালন / ১০০ বর্গ ফুট)। প্রয়োজনে অবশ্যই বৃষ্টিপাতের পরিপূরক করতে হবে। ব্লু-বেরিতে ওভারহেড (ছিটানো) সেচ ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে ট্রিকল বা ড্রিপ সেচ পছন্দ করা হয় কারণ এটি আর্দ্রতা-সংরক্ষণ করে এবং পাতা ভেজায় না ।

ফল সংগ্রহ

শেষ রঙ পরিবর্তনের প্রায় এক সপ্তাহ পরে তারা সাধারণত ফসল কাটার জন্যপ্রস্তুত। যেহেতু শুধুমাত্র প্রতিটি ক্লাস্টারে কয়েকটি বেরি পাকা হবে যে কোনো সময় এটি ছয় দিনেরব্যবধানে তিন বা চারটি পিকিং পর্যন্ত সংগ্রহ করতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যাবস্থাপনা

লিফ রোলার, স্কেল, মাইট হলে সমস্যা হতে পারে এবং উপযুক্ত যৌগ স্প্রে করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।



৩২. কফি চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: কফি
ইংরেজি নাম: Coffee
বৈজ্ঞানিক নাম: *Coffea arabica, Coffea robusta*

ভূমিকা
কফি হল একটি পানীয় যা রোস্ট করা কফি বিন থেকে তৈরি করা হয়। গাঢ় রঙের, তিক্ত এবং সামান্য অম্লীয়, প্রাথমিকভাবে এর ক্যাফিন সামগ্রীর কারণে, কফি মানুষের উপর একটি উদ্দীপক প্রভাব ফেলে। গরম পানীয়ের জন্য বিশ্ব বাজারে এটির বিক্রি সবচেয়ে বেশি। কফি গাছ থেকে কফি বীজ উৎপাদন হয়, তারা-আকৃতির, সাদা ফুল জন্মায় যা জুঁই-এর মতো সুগন্ধি, তারপরে দুই-বীজযুক্ত সবুজ বেরি যা ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়ে গভীর লাল/কালো হয়ে যায়, যা পরে কফিতে পরিণত হয়।

ঔষধিগুণ

কফি পানের সাথে সম্পর্কিত কিছু সম্ভাব্য স্বাস্থ্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে, যেমন -টাইপ-২ডায়াবেটিস, পারকিনসন রোগ, লিভারের রোগ এবং লিভার ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা। কফি খাওয়া কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যকেও ভাল রাখতে সাহায্য করে।

পুষ্টিগুণ

কফিতে ভিটামিন এবং মিনারেল সহ অল্প পরিমাণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট থাকে। একটি সিঙ্গেল সার্ভিংয়ে ১১৮ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৭.২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৭.১ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ০.১ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৪.৭ মিলিগ্রাম ফোলেট, ৬.২ মিলিগ্রাম কোলিন এবং ৪.৮ মিলিগ্রাম সোডিয়াম রয়েছে।

জাত

কফির জাত হল নির্বাচনী প্রজনন বা কফি গাছের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈচিত্র্যময় উপ-প্রজাতি। যদিও বন্য এবং চাষকৃত কফি গাছ উভয় ক্ষেত্রেই প্রচুর পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, সেখানে কয়েকটি জাত এবং জাত রয়েছে যা বিভিন্ন অনন্য এবং অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যেমন-রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ফলের ফলনের কারণে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কফিয়া আরবিকা (Coffea arabica) দ্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারের মতে, ২০০৪ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্বের কফি উৎপাদনেরপ্রায় ৬১ শতাংশের জন্য অ্যারাবিকা কফি ছিল। সি. অ্যারাবিকা প্রজাতির কফির অনেক রকমের বৈচিত্র্য রয়েছে, প্রতিটিরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

কফিয়া ক্যানেফোরা Coffea canephora (Syn. Coffea robusta) ভিয়েতনাম হল বিশ্বের বৃহত্তম উৎপাদক ।

জন্মস্থান/উৎস

কফির উৎপত্তি ইথিওপিয়ায়, এটি ১৫ শতকে লাল সাগর পেরিয়ে ইয়েমেনে উত্তরে তার পথ তৈরি করেছিল। তারপরে এটি আরবের ইয়েমেনি জেলায় জন্মাতে শুরু করে এবং ১৬ শতকের মধ্যে এটি পারস্য, মিশর, সিরিয়া এবং তুরস্কে পরিচিত হয়।



মাটি এবং জলবায়ু

কফি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ুগত কারণগুলি হল তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত। কোনো কফি প্রজাতি ^{o}C এর কাছাকাছি তাপমাত্রা প্রতিরোধ করতে পারে না । ২৩^{o}C এবং ২৮ ^{o}C এর মধ্যে মাঝারি তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি ভাল বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। বছরে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং দুই থেকে তিন মাসের শুষ্ক সময়ের সাথে প্রয়োজন।

মাটি

মাটিগভীর, ভগুর, প্রচুর পরিমাণে হিউমাস এবং সামান্য অম্লীয় প্রকৃতির (pH - ৪.৫ থেকে ৬.৫) চাষের জন্য ভালো।

বংশবিস্তার

কফি বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা যায়।

গর্ত তৈরি

কফির চারা রোপনের জন্য ১.৫ ফুট ০ ১.৫ ফুট ০ ১.৫ ফুট গর্ত করতে হবে। পর্যাপ্ত কম্পোস্ট সার দিতে হবে।

চারা রোপনের দূরত্ব

সারি-সারি দুরত্ব ৫-৭ ফুট ও গাছ-গাছের দুরত্ব ৫-৭ ফুট রাখতে হবে। বাণিজ্যিক চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে ৩০০০-৫০০০টি কফি গাছ রোপন করা হয়।

মাঠের প্রস্তুতি

পছন্দসই ছায়াযুক্ত গাছের সংখ্যা ধরে রাখার সময় নির্বাচনী কাটা করা যেতে পারে। গভীর ঢালু এলাকায় টেরেসিং করা উচিত। গ্রীষ্মের পরে দূরে গর্তখনন করা হয়। গর্তগুলি আবহাওয়ার জন্য খোলা রাখা হয় এবং তারপরে ভরাট করে রোপণের জন্য তৈরি করা হয়।



সার প্রয়োগ

বৃদ্ধি পর্যায়ে প্রতি হেক্টরে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি ফসফরাস এবং ৫০ কেজি পটাশ প্রয়োজন।

সেচ পদ্ধতি

এটি সাধারণত বৃষ্টিনির্ভর ফসল হিসাবে জন্মে। কিন্তু মার্চ-এপ্রিল মাস স্প্রিংকলার দিয়ে সেচ দিলে ফুল ফোটে এবং ফলন বেশি হয়।

গাছের পরিচর্যা

প্রয়োজনে আগাছা ও মালচিং করতে হবে। বর্ষার শেষের দিকে (অক্টোবর -নভেম্বর) ৩০ সেন্টিমিটার গভীরতায় খনন করা হয়। আগাছা এবং গাছপালা ধ্বংসাবশেষ এবং স্টাম্প অপসারণ করার সময় মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। ঢালু এলাকায় ৪৫ সেমি চওড়া এবং ৩০ সেমি গভীরে যেকোন সুবিধাজনক দৈর্ঘ্যের কনটুরে পরিখা খনন করা হয়। রোগে আক্রান্ত অঙ্কুর ছাঁটাই করা হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা:

সাদা কান্ডের পোকা: অপর্যাপ্ত ছায়ায় অ্যারাবিকা কফি আক্রমণ করে।সর্বোত্তম ছায়া বজায় রাখতে হবে। আক্রান্ত গাছগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিহ্নিত করতে হবে,মার্চ এবং সেপ্টেম্বর মাসে উপড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রকোপ বেশি হলে ফেরোমন ফাঁদ ২৫/ha হারে স্থাপন করতে হবে।

মরিচা (Rust): ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ০.৫% বোর্দো মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে, তারপর মে-জুনমাসে ০.০৩% অক্সিারবক্সি স্প্রে করতে হবে। জুলাই-আগস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে উপরোক্ত ছত্রাকনাশকগুলির যেকোনো একটি দিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে হবে অথবা জুন মাসে ০.৫% বোর্দো মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কৌশল

নভেম্বর মাসে ফসল কাটা শুরু হয় এবং ফসল কাটা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হয়। কফি ফল পাকা হওয়ার সাথে সাথে সংগ্রহ করা উচিত। কফি তখনই পাকা হয় যখন আলতো করে ফলগুলোকে চেপে ধরলে ভিতরের শুটিগুলো সহজেই বেরিয়ে আসে। পাপিংয়ের জন্য ফল ব্যবহার করার আগে কাঁচা ফলগুলি সাবধানতার সাথে বাছাই করা উচিত।



৩৩. কাজু বাদামের চাষ পদ্ধতি





বাংলা নাম: কাজু বাদাম
ইংরেজি নাম: Cashewnut
বৈজ্ঞানিক নাম: *Anacardium occidentale L.*

ভূমিকা

কাজু বাদাম একটি নাট বা বাদাম জাতীয় ফল। বৃক্ষ জাতীয় ফসলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাজু বাদামের স্থান তৃতীয়। এর বীজ থেকে পাওয়া বাদাম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মূল্যবান।

ঔষধিগুণ

কাজু বাদাম হৃৎপিন্ডের শক্তিদায়ক; হাড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্যে করে; ক্যান্সার প্রতিরোধ করে; হজমে সাহায্যে করে; চুলের উপকার করে; পিওথলি/কিডনি পাথর তৈরিতে বাধা দেয়; ভালো ঘুম আনয়ন করে; ব্লাড প্রেসার কমায়; ডায়বেটিস রোগীর জন্য উপকারী; রক্ত শূন্যতা কাজ করে; অবসাদ দূর করে ইত্যাদি।

পুষ্টিগুণ

কাজু বাদামের খাদ্য মানের দিক দিয়ে কাজু বাদাম অতি পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর। এ বাদামে শতকরা ২১ ভাগ আমিষ, ৪৭ ভাগ তৈল জাতিয় পদার্থ, ২২ ভাগ শর্করা, ২.৪ ভাগ খনিজ পদার্থ, ০.৪৫ ভাগ ফসফরাস, ০.৫৫ ভাগ ক্যালসিয়াম এবং প্রতি ১০০ গ্রাম বাদামে ৫ মিলিগ্রাম লৌহ ৭৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-১, ১১০ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লোবিন রয়েছে। ভিটামিনসহ অন্যান্য উপকারী অনেক ফাইটো ক্যামিক্যালস রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

জন্মস্থান/উৎস

কাজু বাদামের জন্মস্থান ব্রাজিল।

মাটি এবং জলবায়ু

কাজু বাদাম চাষের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া হলো, গড়ে ২৫ সেন্টিগ্রেড থেকে ২৭ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, ১০০০ মিমি. থেকে ২০০০ মিমি. বার্ষিক বৃষ্টিপাত, ৫০০-১০০০ মিটার সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা এবং বন্যামুক্ত অম্লীয় বালু বা বালু দোঁআশ মাটি। লাল বেলে দোআঁশ সবচেয়ে উপযুক্ত এবংপাহাড়ী ঢাল উপযুক্ত। জুন-ডিসেম্বর চাষের জন্য সর্বোত্তম।



বংশবিস্তার

প্রধানত নরম কাঠের গ্রাফটিং, এয়ার লেয়ারিং এবং এপিকোটিল গ্রাফটিং দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয়।

গর্ত তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মিটার × ৭ মিটার দূরত্বে ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

সার হল গাছের খাবার। কাজু বাদাম যদিও মাঝারি মানের উর্বর জমিতে হয়। কিন্তু ভালো ফলন পেতে হলে জৈবসার, ইউরিয়া, টিএসপি/ ডিএপি, এমওপি, জিংক ও বোরন সার পরিমিত মাত্রাই প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ পদ্ধতি

কাজু বাদাম শুকনা আবহাওয়াতেও ফল দিতে পারে তবে শুকনা মৌসুমেসেচ দিতে পারলে ফলন প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গাছের পরিচর্যা

সঠিকভাবে বাগান পরিচর্যা করার জন্য বাগানঅবশ্যই আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। আবার মানসম্পন্ন ফসল সংগ্রহে সুবিধা হয়।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

এতে পোকামাকড়সহ রোগবালাই অনেক কম হয়।

কান্ড ছিদ্র কারি পোকাঃ

এপোকা গাছের কান্ড ছিদ্র করে ফেলে।

দমন পদ্ধতিঃ

আক্রান্ত অঙ্কুর সংগ্রহ এবং ধ্বংসকরা। বছরে দুবার বর্ষা শুরু হওয়ার আগে (মার্চ-এপ্রিল) এবং বর্ষা শেষ হওয়ার পরে (নভেম্বর) কয়লা-টার + কেরোসিন মিশ্রণ (১:২) পেইন্টিং বা কার্বারিল ৫০ WP (৪ গ্রাম/লিটার) সাসপেনশন দিয়ে মুছে ফেলা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ৫% নিমের তেল দিয়ে গাছের গুঁড়ির ছালে দেওয়া। প্রারম্ভিক পর্যায়ে আক্রান্ত গাছ থেকে গ্রাব অপসারণ করা এবং ক্লোরপাইরিফস ০.২% @ ১০ মিলি/লিটার বা নিম তেল ৫% দিয়ে ক্ষতির অংশ ভিজিয়ে রাখা।

ডাই ব্যাক বা পিঙ্ক রোগঃ আক্রান্ত গাছের প্রধান কান্ড কাটলে কীলক আকারের বাদামি ক্ষত দেখা যায়, যা কাঠের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছায়। কচি কান্ডও ডাইব্যাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত গাছের কোষ কলার ভেতরের অংশ মরে যায় এবং কুঁড়ির বৃদ্ধি থেমে যায় বা দেরি হয়। ফলে গাছের ডাল বা কান্ড মাথা থেকে কালো হয়ে নিচের দিকে মরতে থাকে। এ লক্ষণ ক্রমে কান্ডের মধ্য দিয়ে শিকড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

দমন পদ্ধতিঃ আক্রান্ত অংশের ঠিক নীচে আক্রান্ত অঙ্কুর ছাঁটাই করে এবং বোর্দো পেস্ট লাগাতে হবে। ১% বোর্দো মিশ্রণ এর মতো যে কোনও কপার ছত্রাকনাশক স্প্রে করে দুবার অর্থাৎ মে-জুন মাসে এবং আবার অক্টোবরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ফল সংগ্রহ

সঠিক সময়ের কাজু বাদাম সংগ্রহ করতেহয়। সাধারণত আমাদের দেশে মে-জুন মাসে কাজু বাদাম পরিপক্ব হয়। পরিপক্বের পরপরই এ বাদাম সংগ্রহ করতে হয়। পরিপক্ক হলে বাদাম গাছ থেকে পড়ে যায়। কাঁচা অবস্থায় এ বাদামের ফল থেকে বাদামটি বেশ বড় এবং নরম থাকে। পাকার সময় বাদামটি ছোট এবং পরিপুষ্ট হয়। তখনই বাদাম সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ব বাদাম থেকে কখনও ভালো মানসম্পন্ন কাজু বাদাম পাওয়া সম্ভব নয়।

ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ কৌশল

এদেশে কাজু বাদাম সংগ্রহের সময় সাধারণত মে থেকে জুলাই মাস। এ সময় আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাতাসে আর্দ্রতা থাকেও প্রচুর। কাজু বাদাম তৈলাক্ত জাতীয় ফসল। বাদামটিকে প্রচুর আর্দ্রতাসহ গুদামজাত করা হলে ভিতরে বাদাম বা কার্নেল অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বাদামে উপরের রং ও নষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক বাজারেও এর মূল্য অনেক কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি করা যায় না। তাই ফসল সংগ্রহের পর পরই বাদামগুলো ভালভাবে শুকানো প্রয়োজন। শুকনা বাদামগুলো বায়ুরোধক বস্তায় সংরক্ষণ করা উচিত। সঠিকভাবে গুদামজাত করা হলে বাদামের গুণাগুণ ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।

কাজু প্রক্রিয়াকরণ

কাজু প্রক্রিয়াকরণকে এডিবল মিট অংশ পুনরুদ্ধার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কাঁচা বাদাম থেকে ম্যানুয়াল বা যান্ত্রিক উপায়ে কার্নেল সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশে প্রক্রিয়াকরণটি ম্যানুয়াল উপায়ে হয়,

যেমন-

১. রোস্টিং
২.শেলিং
৩.পিলিং
৪. সোয়েটিং
৫. গ্রেডিং
৬. প্যাকিং



৩৪. ম্যাকাডেমিয়া বাদাম





বাংলা নাম: ম্যাকাডেমিয়া বাদাম
ইংরেজি নাম: Macademia Nut
বৈজ্ঞানিক নাম: *Macademia ternifolia*

ভূমিকা

ম্যাকাডেমিয়া অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলের ক্রান্তীয় অঞ্চলের চিরসবুজ দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজী উদ্ভিদের Proteacea গোত্রের বাদাম জাতীয় ফল। এটি কুইন্সল্যান্ড বাদাম নামেও পরিচিত। এই প্রজাতির বাদাম বাণিজ্যিক ভাবেও উৎপাদন করা হয়। বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত প্রজাতি গুলোরমধ্যে সবচেয়ে পরিচিত Macademia ternifolia নামক প্রজাতিটি, এর খোসা মসৃণ। বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত আরেকটি প্রজাতি হলো Macademia integrifolia, এর খোসা অমসৃণ। এছাড়া Macademia tretraphylla নামক আরও একটি প্রজাতি রয়েছে। পাতা চর্বিযুক্ত, সরু, প্রায় ৩০ সেমির মতো লম্বা। ফল মাংসাল, চর্বিযুক্ত ও ক্যালোরি যুক্ত। ফলে ২ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট বীজ থাকে। ফলে ও বীজে ৭০ শতাংশের উপর চর্বি থাকে। ফলে এটি টাটকা বা রোস্ট করে উভয় ভাবেই খেতে ভাল লাগে।

পুষ্টিগুণ

এগুলি মিষ্টান্ন এবং চকলেট বেকারি গুলিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলি ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন এবং ভিটামিন বি এর একটি ভাল উৎস এবং এতে ৭৩ শতাংশ চর্বি রয়েছে।

জাত

বাণিজ্যিকভাবে জন্মানো ম্যাকাডামিয়া প্রধানত দুটি প্রজাতির, মসৃণ খোসাযুক্ত ম্যাকাডামিয়া ইন্টিগ্রিফোলিয়া (Macadamia integrifolia) এবং রু-খোলসযুক্ত এম. টেট্রাফিলা (Macadamia tetraphylla)। একটি তৃতীয় প্রজাতি এম. টারনিফোলিয়া, কখনও কখনও চাষ করা হয়।

জন্মস্থান/উৎস

গাছের উৎপত্তি উপকূলীয় রেইনফরেস্ট এবং বর্তমানে উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড এবং বেশ কয়েকটি উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে জন্মানো হয়।

জলবায়ু এবং মাটি

একটি বাগানের ফসল হিসাবে, ম্যাকাডামিয়ার প্রয়োজন সমৃদ্ধভাল-নিষ্কাশিত মাটি এবং বছরে ১৩০ সেমি (৫০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত। বিভিন্ন ধরনের মাটিতে ফসল ভালোভাবে জন্মায়। জৈব উপাদান সমৃদ্ধ হালকা ছিদ্রযুক্ত সুনিষ্কাশিত মাটি চাষের জন্য সবচেয়েউপযোগী।

বংশ বিস্তার

এটি একটি স্ব-পরাগায়নকারী গাছ যা বীজ থেকে বংশ বিস্তার করে। গাছ পরিপক্ক হতে ১০ বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে এবং এটি ফল দিতে পারে বা নাও পারে। বিকল্পভাবে, কলম করা গাছ দিয়ে শুরু করে বংশ বিস্তার করা ভাল হয়।

চারা রোপণ

এপ্রিল থেকে জুলাই এ সময় লতা ও চারা সংগ্রহ এবং রোপণ করা হয়।

সার প্রয়োগ

রোপণের পরে প্রায় ছয় মাস অপেক্ষা করা উচিত, তারপর সুষম সার প্রয়োগ করা ভাল যাতে ১ শতাংশ নাইট্রোজেন বা তার কম থাকে, যেমনটি ধীর-বর্ধমান উদ্ভিদের জন্য উপযুক্ত।

সেচ পদ্ধতি

একটি হালকা সেচ চারা রোপণ করার ঠিক পরে দেওয়া হয় মাটির আর্দ্রতা এবং গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য। ম্যাকাডামিয়াতে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয়, বিশেষত অল্প বয়সে। যদি বৃষ্টি না হয়, একটি সাপ্তাহিক সেচের প্রয়োজন হয়। উপরন্তু, এটি হিম বা উচ্চ বাতাস সহ্য করতে পারে না, এবং উভয় থেকে সুরক্ষা প্রয়োজন।

ফলন

যখন একটি সুস্থ গাছ পরিপক্কতায় পৌঁছায়, এটি প্রতি বছর ৩০ থেকে ৫০ পাউন্ড বাদাম উৎপাদন করবে।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কৌশল

বাদাম কখন পাকা হয় তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল, তাই মাটিতে না পড়া পর্যন্ত ম্যাকাডামিয়া সাধারণত কাটা হয় না। পরিপক্ব ফলগুলোকে হাত দিয়ে সংগ্রহ করা হয়, মেশিনের সাহায্যে শুকানো হয় এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। একটি শীতল, শুষ্ক স্থানে দুই থেকে তিন সপ্তাহের জন্য বাতাসে শুকানো হয়, যাতে তাদের খোলস থেকে কার্নেল আলগা হয়। এগুলিকে বায়ুরোধী জারে সংরক্ষণ করতে হয় বা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সেগুলি হিমায়িত করতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক - যখন একটি গাছ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যেমন আগাছার খোসা থেকে কাটা, এটি একটি "ক্যানকার" বা একটি ক্ষত তৈরি করতে পারে যা ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটায়। এরকম একটি ছত্রাক হল ফাইটোফথোরা রামোরাম। আরেকটি ছত্রাক হল Anthracnose, বা Colletotrichum gloeosporioides, যা পাতা এবং ভুসিতে গাঢ় ক্ষত সৃষ্টি করে যা কার্নেলকে প্রভাবিত করতে পারে (বা নাও পারে)। বোট্রিটিস সিনারিয়াল, ওরফে রেসিমে ব্লাইট, ফুলের ডালপালা, বা রেসিমগুলিকে ছাঁচে পরিণত করে এবং মারা যায়।



ফলের কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

❖ যখন কোনও সমস্যার লক্ষণগুলি লক্ষ করা যায়, সঠিকভাবে সমস্যাটি শনাক্ত করতে হবে (আগাছা, পোকামাকড়, রোগ, পরিবেশ-গত), পরিবর্তনগুলির জন্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে (ক্রমবর্ধমান তীব্রতা) এবং ব্যবস্থাপনা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

❖ পরিবেশগত কারণের (অজীব উপাদান) প্রচুর সমস্যা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অত্যধিক বা খুব কম পানি বা পুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্থান, সূর্যালোক, সংকুচিত মাটি, তাপমাত্রার চরম মাত্রা এবং চাষ থেকে শিকড়ের ক্ষতি।

❖ এছাড়াও, কিছু সাধারণ সমস্যার তীব্রতা আবহাওয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং বাগান করার সিদ্ধান্তের সাথে (অনুপযুক্ত জাত নির্বাচন করা, নিম্নমানের গাছপালা কেনা, ভুল ব্যবধান ইত্যাদি)জড়িত।

প্রতিরোধ, নিরীক্ষণ এবং ফলের সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করা:

কীটপতঙ্গ সমস্যা প্রতিরোধ ও পর্যবেক্ষণ করারজন্য সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা (IPM) পদ্ধতি সুপারিশ করা হয় যা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা হল:

১. নিয়মিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গাছপালা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
২. পর্যবেক্ষণ করে সমস্যারকারণগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
৩. সমস্যার পূর্বাভাস এবং প্রতিরোধ করতে হবে।
৪. অবনতির লক্ষণগুলির জন্য সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৫. যদি কীটনাশক প্রয়োজন হয়, কম-বিষাক্ত উপাদান নির্বাচন করতে হবে এবং ঘনিষ্ঠভাবেলেবেল নির্দেশাবলী অনুসরণ করা উচিত।

জৈব উপাদান দ্বারা পোকামাকড় প্রতিরোধ:

জৈব উপাদান দ্বারা IPM পদ্ধতিটি প্রচলিত চাষীদের দ্বারা নিযুক্ত পদ্ধতির প্রায় কাছাকাছি হওয়া উচিত। পার্থক্য হল যে জৈব চাষীকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সমস্যাগুলি প্রতিরোধ ও পরিচালনার জন্য চাষাবাদ এবং শারীরিক কৌশলগুলির উপর আরও বেশি নির্ভর করতে হবে এবং শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্য জৈব স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে জৈব কীটনাশকগুলি সাধারণত রাসায়নিক কীটনাশকের মতো কার্যকর নয় এবং এটি উপকারী পোকামাকড়কেও (পরাগায়নকারী এবং কীটপতঙ্গের প্রাকৃতিক শত্রু) নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতেপারে।

কালচারাল এবং ফিজিক্যাল নিয়মে নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন:

পোকামাকড় এবং রোগের সমস্যা কমাতে নিম্ননিয়মগুলি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অনুশীলনের অংশ হওয়া উচিত।

১. সম্ভব হলে রোগ-প্রতিরোধী জাত নির্বাচন করুন।
২. গরু এবং ছাগল থেকে ছোট ফল এবং গাছের ফল রক্ষা করতে বেড়া ব্যবহার করুন।
৩. ঝরে পড়া ফল এবং পাতাসহ সমস্ত সংক্রমিত এবং রোগাক্রান্ত গাছের অংশগুলি সরান এবং নিষ্পত্তি করুন।
৪. আগাছা হাত দিয়ে টানুন বা গাছের চারপাশে জৈব মালচ প্রয়োগ করুন। আগাছা জল এবং পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা করে এবং পোকামাকড় পোকামাকড়কে আশ্রয় দিতে পারে।
৫. সূর্যালোক অনুপ্রবেশ, স্প্রে কভারেজ, এবং বায়ু সঞ্চালন উন্নত করতে সঠিকভাবে ছাঁটাই করুন। মৃত, ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত শাখা, বেত বা ডালপালা ছেঁটে ফেলুন।
৬. সুপারিশ অনুসারে সার প্রয়োগ করে এবং প্রাথমিক বড়হওয়ার সময় এবং শুষ্ক সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে গাছে জল দিয়ে গাছগুলিকে সুস্থ রাখুন।
৭. কীটপতঙ্গের সমস্যা কমাতে পৃথক আপেল এবং পীচের চারপাশে ছোট ব্যাগ বেঁধে রাখুন।

ফল চাষাবাদের জন্য আইপিএম পদ্ধতির একটি অংশ হিসাবে কীটনাশক:

- কীটনাশক ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল কীটপতঙ্গের সংখ্যাকে মাত্রার নীচে রাখা যার ফলে মাঝারি থেকে কম ক্ষতি হতে পারে।
- প্রতিটি বাড়ির বাগানে প্রয়োজনীয় কীটনাশক এবং তাদের প্রয়োগের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং অনেক কম হতে পারে।
- কীটনাশক শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা উচিত, এবং তারপরে লেবেলের নির্দেশাবলী অনুযায়ী কঠোরভাবেতা মেনে চলতে হবে ।
- এক বা একাধিক গুরুতর সমস্যা সাধারণত আপেল, নাশপাতি, পীচ, চেরি এবং বরই গাছে দেখা দেয়। ছোট ফল গাছে সাধারণত কম কীটপতঙ্গের সমস্যা থাকে এবং সেই গাছের ফলের তুলনায় জৈবভাবে বেশি সফলহওয়া যায়।
- যদি একটি বিশেষ কীটপতঙ্গ বা রোগের সমস্যা থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা উচিত। এটি বিশেষত নির্দিষ্ট রোগের জন্য যেমন কার্যকরী তেমন পীচের বাদামী পচা, আঙ্গুরের কালো পচা এবং আপেলের স্ক্যাব এবং মরিচা রোগের জন্যও। এই রোগগুলি শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান মৌসুমের শুরুতে নির্ধারিত, প্রতিরোধমূলক স্প্রে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- আবহাওয়ার পরিবর্তন, গাছপালা এবং ফলের পরিপক্কতা এবং উদ্যানপালকদের দ্বারা অনুসরণ করা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে তারা বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। ক্রমবর্ধমান ঋতুর প্রথম দিকে ফল ফসলের যত্নশীল ব্যবস্থাপনা কিছু কীটপতঙ্গকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে যা পরবর্তীতে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়।

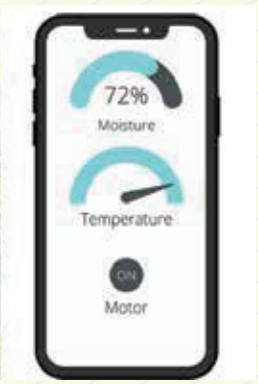





আইওটি বেইজড স্মার্ট কৃষি

স্মার্ট কৃষি বলতে বাগানে/খামারে ইন্টারনেট অব থিংস, সেন্সর, লোকেশন সিস্টেম, অটোমেশন, রোবটিক্স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায়। স্মার্ট সেচ একটি সেন্সর যা মাটি, পানি, আলো, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার প্লাটফরম; অবস্থান সিস্টেম- জিপিএস, স্যাটেলাইট, যোগাযোগ ব্যবস্থা- মোবাইল সংযোগ; রোবট; বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজেশান প্লাটফরম, আর এই সমস্ত প্রযুক্তির মধ্যে সংযোগ হলো ইন্টারনেট অব থিংস যা প্রাপ্ত ডেটার ওপর ভিত্তি করে খামার পরিচালনা করে থাকে। এটির লক্ষ্য হলো পানির অপচয় রোধ, শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা এবং শ্রমিক খরচ হ্রাস।





আইওটি বেইজড সেচ একটি উন্নত সেচ ব্যবস্থা যা গাছের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সেচের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করতে প্রযুক্তি এবং ডেটা ব্যবহার করে। এটি উদ্ভিদের প্রয়োজনে এবং পরিবেশগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে সঠিকভাবে সেচ সরবরাহ করার জন্য সেন্সর, আবহ-াওয়ার ডেটা এবং অটোমেশনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

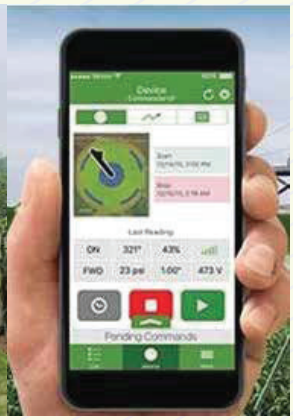
এটি রিমোট কন্ট্রোল এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রদান করে, ব্যবহারকারী-রা তাদের সেচ ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টভাবে এবং সুবিধাজনকভাবে পরিচালনা করতে পারে। কাস্টমাইজেশন বিকল্প এবং আবহাওয়া ডেটার সাথে একীকরণের সাথে, স্মার্ট সেচ সর্বোত্তম উদ্ভিদ বৃদ্ধি এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করার জন্য দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা। এসব ব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের খামারের প্রক্রিয়াগুলো নিরীক্ষণ করতে পারে এবং দূর থেকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
ফল বাগানের জন্য স্মার্ট সেচ ব্যবস্থা সেচের পরিমাণ নিয়ন্ত্রন করে পানি সংরক্ষণ করে আদ্রতা ধরে রাখে ফলন বাড়ায়, পানির অপচয় রোধ করে। মাইক্রোকন্ট্রোলার ব্যবহার করি যা বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য প্রক্রিয়া করে এবং ফল গাছের সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ প্রদান করা যায়। পুরো ইন্টারফেসটি একটি অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায়। আবহাওয়ার তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায় যা রিমোট সেন্সিংয়ের মাধ্যমে নেওয়া হয়।

স্মার্ট সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্প্রিংকলার সেচ কৃষি খামার এবং বাগানের জন্য সেচের সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম। এই সেচ পদ্ধতিতে বৃষ্টির পানির মতো সেচ প্রদান করা যায়।

স্প্রিংকলার সেচের উপকারিতা:

- ❖ স্প্রিংকলার সেচ এর মাধ্যমে সরাসরি ফসলের পৃষ্ঠে পানি স্প্রে করা যায়।
- ❖ এটি বাষ্পীভবন এবং প্রবাহের মাধ্যমে পানির অপচয় কমায় এবং ফসলগুলি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়া যায়।
- ❖ স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা টাইমার এবং সেন্সর ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় হতে পারে। এই অটোমেশন বৈশিষ্ট্যটি সুনির্দিষ্ট সেচ সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং ফসল বা বাগানে অতিরিক্ত জল দেওয়া রোধ করে, সামগ্রিক পানির ব্যবহার হ্রাস করে।
- ❖ স্প্রিংকলার সেচ অন্যান্য সেচ পদ্ধতির তুলনায় কম শ্রম ব্যবহার করে। এটি পরিশ্রম ছাড়াই সিস্টেমটি সহজেই ইনস্টল এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।
- ❖ স্প্রিংকলার সেচ ফসলের ফলন বাড়াতে সাহায্য করে কারণ এটি প্রয়োজনীয় পরিমাণে সেচ সরবরাহ করে, আগাছার বৃদ্ধি কমায় এবং মাটিতে পুষ্টির শোষণ উন্নত করে।
- ❖ গাছের বংশবিস্তার এবং ফসল চাষের জন্য গ্রীনহাউসে স্প্রিংকলার সেচ ব্যবহার করা হয়। সিস্টেমটি একটি সুনির্দিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চারাগুলিতে পানি এবং পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে।





চাষাবাদ থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ সবক্ষেত্রে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার যেমন রিমোট কন্ট্রোল, অটোমেশন, ড্রোন ব্যবহার, স্মার্ট সয়েল ময়েশ্চার সেন্সর ব্যবহার, পিএইচ সেন্সর, আইওটি ভিত্তিক স্মার্ট কৃষি খামার ব্যবস্থাপনা, রিমোট সেনসিং এবং জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগের পূর্বাভাস প্রদান ও দমন ব্যবস্থাপনা, রোবটিক্স (ক্ষেত্র বিশেষে) ইত্যাদি ব্যবহারে কম খরচে অধিক ফলন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা দরকার।

আইওটি বেইজ ড্রিপ ইরিগেশনঃ

মাটিতে কৌশলগত সমস্যা যেমন নিম্নমানের পাইপ, ফুটো, এবং অসময়ে সেচের সময়সূচী, যা জলের অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং মাটির আর্দ্রতাকে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রে দখা গেছে, কৃষকরা তাদের ফসলের পানির চাহিদা পূরণের জন্য পানি কিনছেন, ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি IoT-ভিত্তিক স্মার্ট ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা বাস্তবে বৃক্ষ রোপণ/ফসলের মাঠের আদ্রতা নির্নয় করে সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এর প্রধান সুবিধা হল অ্যাপিকেশনের জন্য দূরবর্তী স্থান হতে পরিচালনা করা যায়। এটি হল প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্মার্ট ড্রিপ যা প্রয়োজনমতো সেচ প্রদান করা যায়।

IoT-ভিত্তিক ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম সেন্সর এর মাধ্যমে ফসলের ধরন, পর্যায়, অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট সেচ, বিগত বছরের ডেটা, স্যাটেলাইট ইমেজ ইত্যাদি।
এই ধরনের একটি IoT-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থা নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য করে।

- পানির উপযুক্ত ব্যবহার এবং পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করে।
- স্বয়ংক্রিয় অপারেশন করা যায় এবং শ্রমিক খরচন হ্রাস করে।
- সেচ ব্যবস্থা পরিচালনা করতে কৃষকদের প্রতিবার মাঠে যেতে হবে না।
- IoT সিস্টেম কৃষকদের মাটির আর্দ্রতা, ফসল বৃদ্ধির পর্যায়ে এবং সংশ্লিষ্ট জলের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।
- খাদ্য উৎপাদনে খরা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করে।
- সার লিচিং দ্বারা সৃষ্ট ভূগর্ভস্থ জল এবং নদী দূষণ হ্রাস করে





জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আদ্রতা কমে যাওয়া, এবং কৃষি জমিতে ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যায় সেচের চাহিদা মেটাতে স্মার্ট সেচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি দেওয়ার সময়সূচী এবং সঠিক ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে। স্প্রিংকলার সেচ ও ড্রিপ সেচ পদ্ধতি, ঘরে বসে ডিজিটাল সেচ যন্ত্র পরিচালন-ার মাধ্যমে জমিতে আর্দ্রতা বৃদ্ধি করার জন্য স্মার্ট সেচ অতিব জরুরী।

ফলের বিভিন্ন রকমের দ্রব্য তৈরি

ফল প্রক্রিয়াজাতকরণঃ

প্রক্রিয়াজাতকরণ হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান, যার মাধ্যমে পুষ্টি ও অন্যান্য গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গুণগতমান নির্ভর করে মূলত প্রক্রিয়াজাত প্রক্রিয়া শুরু করার সময় তাদের গুণগতমান কেমন ছিল তার উপর।

প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা?

অধিকাংশ ভোক্তাই সবচেয়ে তাজা ফল এবং সবজি পেতে ও খেতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সকল বিচিত্র রকমের ফল ও সবজি বছরব্যাপী উৎপাদন করা যায় না। কিছু ফল আছে নির্দিষ্ট অঞ্চলে জন্মায়, আবার অনেক সুস্বাদু ফল স্বল্প সময়ের জন্য জন্মায় এবং সে সময়টি পার হওয়ার পর আর সে ফলগুলো পাওয়া যায় না। এ সমস্ত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পর তাজা ফলের স্বাদ গ্রহণের জন্য ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি আদর্শ বিকল্প।

প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ফলের

ক) প্রাপ্যতা সময় বৃদ্ধি পায়,
খ) ফল সংরক্ষণের সময় কম নষ্ট হয় এবং সংরক্ষণ সময় বৃদ্ধি পায়,
গ) খাদ্যের অনুজৈবিক এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা বাড়ে এবং
ঘ) খাদ্যেও বৈচিত্রতা বৃদ্ধি পায়।

ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে জাত নির্বাচন এবং ফলের পরিপক্বতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, ফল তাজা, ফ্রোজেন এবং প্রক্রিয়াজাত যে অবস্থায়ই খাওয়া হোক না কেনো, তা বর্ণ, গন্ধ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পুষ্টিমানের দিক দিয়ে প্রায় একই রকম এবং তা শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়ার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রক্রিয়াজাতকরণ (পাত্রে সংরক্ষণ বা ক্যানিং, শুষ্ককরণ বা ড্রাইং, নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ বা ফ্রিজিং এবং জুস, জ্যাম ও জেলি তৈরিকরণ) ফলের ভক্ষণোপযোগী সময় বৃদ্ধি করে। প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপসমূহ হলো; মূল উপাদানসমূহ তৈরি যেমন-পরিষ্কারকরণ, অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলা ও খোসা ছাড়ানো, এবং পরবর্তীতে রন্ধন, ক্যানিং অথবা ফ্রিজিং।

ফল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমাদের দেশে থাকা সহায়ক উপাদানসমূহ:

১. মৌসুমে ফলের সহজপ্রাপ্যতা ও স্বল্প বাজার মূল্য;



২. অন্যান্য দেশের তুলনায় অব্যবহৃত প্রচুর শ্রমের উপস্থিতি ও তার স্বল্পমূল্য;
৩. দেশে ও বিদেশে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা;
৪. এ কর্মকান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি, যা দেশের সর্বত্রই পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে;
৫. মোড়কীকরণ সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াজাতকরণ রাসায়নিক দ্রব্য এখন আমাদের দেশে সহজেই পাওয়া যায়;
৬. সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রবর্ধমানের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে বিধায় ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য বা ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ স্বল্প ও দীর্ঘ সময়ের জন্য করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন ফলের কিছু প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যের বিবরণ দেয়া হলো:

জ্যাম প্রস্তুতি প্রণালী:

জ্যাম হল এমন একটি পণ্য যা ফলের খোসাকে সিদ্ধ করে যথেষ্ট পরিমাণে চিনির সাথে যথেষ্ট ঘন সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরি করা হয়। আপেল, সফেদা, পেঁপে, বরই, আম, আঙ্গুর, আনারস, কলা, পেয়ারা এবং নাশপাতি জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এটি এক ধরণের ফল বা দুই বা ততোধিক ধরণের থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে। এর প্রস্তুতিতে প্রতি ৫৫% চিনির জন্য প্রায় ৪৫% ফলের পাল্প ব্যবহার করা উচিত। জ্যামের স্পেসিফিকেশন হল প্রতি ১০০ গ্রাম প্রস্তুত পণ্যে ৬৮.৫% TSS, ৪৫% ফলের পাল্প এবং ০.৫-০.৬% অ্যাসিড (সাইট্রিক অ্যাসিড)।

ক) ফল নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা:

ভালো মানের পাকা ফল নির্বাচন করুন। ঠান্ডা পানিতে ফল ভালো করে ধুয়ে নিন। ফলের খোসা ছাড়ুন এবং এর মধ্যে উপস্থিত শক্ত অংশ এবং কোরগুলি সরিয়ে ফেলুন। স্টেইনলেস স্টিলের ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়ানো ফলগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। ফল শক্ত হলে খুব ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

খ) চিনি এবং অ্যাসিড মিশানো: এরপর চিনি এবং অ্যাসিড মিশিয়ে নিন।

গ) রান্না: এরপর চুলাতে রান্না করুন। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে মিশ্রণটি ধীরে ধীরে রান্না করুন। রান্নার সময় ফলের পাল্প গুঁড়ো করতে হবে। তাপমাত্রা ১০৫.৫^{o}C না হওয়া পর্যন্ত রান্না চালিয়ে যান। একটি চামচ দিয়ে ফুটানোর সময় কিছু অংশ নিয়েকিছুটা ঠান্ডা করুন। যদি সিরাপটিপ্রবাহিত হওয়ার পরিবর্তে শীট বা ফ্লেক্সের আকারে পড়ে যায় তবে এর অর্থ পণ্যটি প্রস্তুত। অন্যথায় শীট পরীক্ষা পজিটিভ না হওয়া পর্যন্তফুটানো অব্যাহত রাখতে হবে।

ঘ) প্যাকেজিং: পরিষ্কার শুকনো জীবাণুমুক্ত বয়ামে গরম জ্যামটি পূরণ করুন। জ্যাম ঠান্ডা হতে দিন এবং বয়ামের মুখ জীবাণুমুক্ত ঢাকনা দিয়ে আটকিয়ে নিন। একটি শীতল স্থানে সংরক্ষণ করুন।

সম্পুরণ প্রক্রিয়াটি ডায়াগ্রামে দেখানো হলঃ

পাকা দৃঢ় ফল -ধোয়া -খোসা ছাড়ানো -পাল্পিং (বীজ এবং মূল সরান) -চিনি এবং অ্যাসিডের সংযোজন -ফুটন্ত (একটানা নাড়তে) -শীট দ্বারা ১০৫^{o}C (বা) ৬৮% TSS (বা) পর্যন্ত রান্না করে শেষ করা -জীবাণুমুক্তবোতলে গরম ভর্তি করা -কুলিং -ওয়াক্সিং -ক্যাপিং -স্টোরেজ (পরিবেষ্টিত শীতল তাপমাত্রায়)।

জেলি প্রস্তুতি প্রণালী:

জেলি হল একটি আধা কঠিন দ্রব্য যা পেকটিনযুক্ত খোসামুক্তফলের নির্যাস, চিনি এবং অ্যাসিড যোগ করার পর একটি পরিষ্কার, ছাঁকানো দ্রবণকে ফুটিয়ে তৈরি করা হয়। একটি নিখুঁত জেলি স্বচ্ছ হওয়া উচিত কিন্তু খুব শক্ত নয় এবং ফলের আসল গন্ধ হওয়া উচিত।
এটি আকর্ষণীয় রঙের হওয়া উচিত এবং ছাঁচ থেকে সরানোর সময় এটির আকৃতি ঠিক রাখা উচিত। এটিতে আঠালো বা সিরাপী বা স্ফটিক চিনি থাকা উচিত নয়। জেলির জন্য স্পেসিফিকেশন হল চূড়ান্ত পণ্যটিতে ৬৫% কঠিন পদার্থ, ৪৫% ফলের নির্যাস এবং ০.৫-০.৭৫% অ্যাসিড থাকতে হবে।

ফল নির্বাচন এবং প্রস্তুত করা: পেয়ারা, টক আপেল, বরই, করন্দা, পেঁপে এবং কাঁঠাল ফল পেকটিন সমৃদ্ধ এবং সাধারণত জেলি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আনারস, স্ট্রবেরি, আঙ্গুর ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে তবে পেকটিন পাউডার যোগ করার পরে, কারণ এই ফলগুলিতে পেকটিন কম থাকে। জেলি তৈরি জ্যামের মতোই।

সম্পুরণ প্রক্রিয়াটি ডায়াগ্রামে দেখানো হলঃ

ফল (দৃঢ়, বেশি পাকা নয়)-ধোয়া -পাতলা টুকরো করে কাটা - পানি দিয়ে ফুটানো (প্রায় ২০-৩০ মিনিটের জন্য ফলের ওজনের ১½ গুণ) -ফুটানোর সময় সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করা (প্রতি কেজি ফল ২ গ্রাম) -নির্যাসের স্ট্রেনিং -পেকটিন পরীক্ষা (চিনি যোগ করার জন্য) -চিনি যোগ করা -ফুটন্ত -শেষ বিন্দু বিচার করা (শীট/ড্রপ/টেম্প টেস্ট) -স্কাম (বা) ফোম অপসারণ (৪৫ কেজি চিনির জন্য এক চা চামচ ভোজ্য তেল যোগ করা হয়েছে) -রঙের সংযোজন এবং অবশিষ্ট সাইট্রিক অ্যাসিড -পরিষ্কার জীবাণুমুক্তবোতলে গরম ভরে -ওয়াক্সিং (প্যারাফিন মোম)-ক্যাপিং -পরিবেষ্টিত শীতল তাপমাত্রায় স্টোরেজ।

জেলি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়:

পেকটিন, অ্যাসিড, চিনি (৬৫%) এবং পানি চারটি অপরিহার্য উপাদান। জেলির মানের জন্য পেকটিন পরীক্ষা এবং জেলি গঠনের শেষ বিন্দু নির্ধারণ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ।

মার্মালেড প্রস্তুত প্রণালী:

এটি একটি ফলের জেলি যাতে ফলের স্লাইস বা এর খোসা উস্থিত থাকে। শব্দটি সাধারণত কমলা এবং লেবুর মতো সাইট্রাস ফল থেকে তৈরি পণ্যগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে ছিন্ন খোসা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাইট্রাস মার্মালেড (১) জেলি মার্মালেড (২) জ্যাম মার্মালেড এইদুই শ্রেণীর হয়। এটির স্পেসিফিকেশন TSS ৬৫% এবং ফলের রস ৪৫% এর উপকরণ-পেকটিন নির্যাস-১ লিটার
চিনি - ৭৫০ গ্রাম
কাটা খোসা - ৬২ গ্রাম

জেলি মার্মালেড প্রস্তুত প্রণালী: এটি পরিষ্কার করা পেকটিন নির্যাস থেকে প্রস্তুত।প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া হলঃ

পাকা ফল -ধোয়া -বাইরের হলুদ অংশের খোসা ছাড়িয়ে পাতলা করা -হলুদ অংশকে সূক্ষ্ম টুকরো টুকরো করে কাটা (১.৯-২.৫ সেমি লম্বা এবং ০.৮-০.১২ সেমি পুরু)-০.৪৫ সেমি খোসা ছাড়ানো ফলের ০.৩ পুরুকরা কাটা -ফুটন্ত (৪০-৬০মিনিটের জন্য পানি এর ওজনের ২-৩ গুণে) -নির্যাস স্ট্রেনিং) -টুকরো সংযোজন(ছেঁড়া খোসা ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য সিদ্ধ করা হয়। নরম করার জন্য এবং তিক্ততা অপসারণের জন্য জলের বিভিন্ন পরিবর্তনে এবং প্রতি কেজি নির্যাসের প্রায় ৬২ গ্রাম যোগ করা হয়) -চিনির পেকটিন কন্টেন্ট পরীক্ষা করা (প্রয়োজন অনুযায়ী) ১০৩-১০৫° সেন্টিগ্রেডে রান্না করা (একটানা নাড়তে থাকা) -ক্রমাগত নাড়া দিয়ে শেষ বিন্দু এর জন্য পরীক্ষা) -পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় স্টোরেজ।

জাম মার্মালেড প্রস্তুত প্রণালী:

প্রস্তুতির পদ্ধতিটি কার্যত জেলি মার্মালেডের মতোই। এই ক্ষেত্রে ফলের পেকটিন নির্যাস পরিষ্কার করা হয় না এবং পুরো খোসা ব্যবহার করা হয়। ফলের ওজন অনুযায়ী চিনি যোগ করা হয়, সাধারণত ১১ অনুপাতে। টিএসএসের পরিমাণ ৬৫% না হওয়া পর্যন্ত খোসা - চিনির মিশ্রণটি রান্না করা হয়।

আচার

আচার অত্যন্ত সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার। প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই আচার খুব লোভনীয় ও আকর্ষণীয় খাবার হিসেবে পরিচিত। যে ফল বা সবজি থেকে আচার তৈরি করা হয় তার উপর আচারের পুষ্টিমান নির্ভর করে। আচারে ভিটামিন সি এবং খনিজ পদার্থ থাকে যা আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন। আচার খাবারে রুচি বৃদ্ধি করে। আচারে তেল বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে যা তাপ শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। যথাযথ নিয়মে তৈরি করলে ফল বা সবজির প্রায় সকল গুণই আচারে অক্ষুণ্ন থাকে। অল্প মূলধনেই আচার তৈরি করা যায়। আচার তৈরি ও বাজারজাত করে সহজেই একজন ব্যক্তি আয় বর্ধনের ব্যবস্থা করতে পারে।

আমের আচার: আমের প্রাপ্যতা সময় মাত্র কয়েক মাস। আবার আম ছোট থাকা অবস্থায় অনেক সময় ঝড়ে অধিকাংশ বা সমস্ত আম পড়ে যায়। ঝড়ে পড়া আম দিয়ে সুস্বাদু আচার তৈরি করে সারা বছর ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করে পারিবারিক আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালি:

১। আমের আচারের জন্য ভালো কাঁচা আম বেছে নিতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
২। আমগুলো লম্বালম্বিভাবে ৬-৮ ভাগ করে কেটে নিতে হবে।
৩। এক কেজি আমের টুকরার সাথে ৪০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে ১০-১৫ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।
৪। অতঃপর টুকরাগুলো উঠিয়ে ৫ গ্রাম হলুদ মিশিয়ে বাঁশের চালুনি বা ট্রেতে ৫-৬ ঘণ্টা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
৫। ওজন করা টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।



৬। আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে।৭। শুকনো মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি আম ভেজে নেয়ার পর কড়াইয়ে অবশিষ্ট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।

৮। ভাজা চলাকালীন ভাজা আমের টুকরা, চিনি, মেথি, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হবে। অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১০ মিলিলিটার গাসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।

৯। অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

জলপাই এর আচার: কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই জলপাই খাওয়া যায়। জলপাইয়ে প্রচুর পুষ্টি উপাদান আছে। জলপাই এর আচার খুবই উপাদেয় এবং সহজেই তৈরি করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে জলপাই আচার তৈরির মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালি



১। জলপাই এর জন্য ভালো জলপাই বেছে নিতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

২। জলপাইগুলো লম্বালম্বি ৩ ভাগ করে কেটে নিতে হবে।

৩। এক কেজি জলপাই টুকরার সাথে ৪০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে ১০-১৫ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

৪। অতঃপর জলপাইগুলো উঠিয়ে ৫ গ্রাম হলুদ মিশিয়ে বাঁশের চালনি বা ট্রেতে ২-৩ ঘণ্টা রৌদে শুকাতে হবে।

৫। ওজন করা টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।

৬। আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলি লিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করতে হবে।

৭। শুকনো মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি জলপাই ভেজে নেয়ার পর অবশিষ্ট তেলে মধ্যে ভেজে নিতে হবে।

৮। ভাজা চলাকালীন ভাজা জলপাই টুকরো, চিনি, মেথি, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হবে। অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১০ মিলি লিটারগেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।

৯। অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

আমড়ার আচার: আমড়া খেতে খুব সুস্বাদু। ভিটামিন-সি ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ এ ফলটি দিয়ে উন্নত মানের আচার ও চাটনি তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালি

১। আমড়ার আচার এর জন্য ভালো আমড়া বেছে নিতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বঁটি বা চাকু দিয়ে আমড়ার উপরের ছাল বা ত্বক ছিলে ফেলে দিতে হবে।

২। আমড়াগুলো লম্বালম্বি ৬-৮ ভাগ করে কেটে নিতে হবে।

৩। এক কেজি আমড়ার সাথে ৪০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে ১০-১৫ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।

৪। অতঃপর আমড়াগুলো উঠিয়ে ৫ গ্রাম হলুদ মিশিয়ে বাঁশের চালনি বা ট্রেতে ২-৩ ঘণ্টা রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।



৫। ওজন করা টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।

৬। আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করতে হবে।

৭। শুকনো মরিচ ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে আমড়া ভেজে নেয়ার পর কড়াইয়ে অবশিষ্ট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।

৮। ভাজা চলাকালীন সময়ে ভাজা আমড়ার টুকরা, চিনি, মেথি, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হবে। অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১৪ মিলিলিটারগেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।

৯। অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

তেঁতুলের সস: প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য তেঁতুলের ১৭-৩৫ গ্রাম পানি, ২-৩ গ্রাম আমিষ, ০.৬ গ্রাম চর্বি, ৪১-৬১ গ্রাম শর্করা, ২.৯ গ্রাম আঁশ, ৩৪-৯৪ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৩৪-৭৮ মিলিগ্রাম ফসফরাস এবং ৪৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে। পেটের বায়ু ও হাত-পা জ্বালায় তেঁতুলের শরবত উপকারী। তেঁতুলে টারটারিক এসিড থাকে যা হজমে সাহায্য করে। তেঁতুলের শরবত ব্যবহারে মাথা ব্যাথা এবং ধুতুরা, কচু ও অ্যালকোহলের বিষাক্ততা নিরাময় হয়। এটা ব্যাবহারে প্যারালাইসিস অঙ্গের অনুভূতি ফিরে আসে। তেঁতুলের সস উপাদেয় একটি খাবার। অতি সহজেই এটা তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালি:



১। তেঁতুল (বীজসহ) তার দ্বিগুণ পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে চটকিয়ে পাল্প তৈরি করতে হবে। দ্রুত করার জন্য গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। পাল্প তৈরি হলে ছাকনি দিয়ে ছেকে বীজ থেকে পাল্প আলাদা করতে হবে।

৩। তেঁতুলের পাল্প এর সাথে চিনি ও লবণ মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এর সাথে মরিচ গুঁড়া মিশাতে হবে।

৪। মসলাগুলো ভেজে গুঁড়া করে নিয়ে পেঁয়াজ ঐ রসুন কুঁচি করে মসলার সাথে একত্রে পাতলা করে কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে মিশ্রনে ছেড়ে দিতে হবে।

৫। জ্বাল চলাকালীন ঘন ঘন নাড়তে হবে এবং হাতা দিয়ে মাঝে মাঝে চেপে পুটলির রস সসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৬। ২০-২৫ মিনিট জ্বাল হলে এবং কাঙ্খিত ঘনত্বে এলে সামান্য পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে সসের সাথে মিশাতে হবে।

৭। জীবাণুমুক্ত বোতলে সস গরম অবস্থাতেই ঢেলে ফেলতে হবে। ছিপি ভালভাবে বন্ধ করার পর বোতলটি কাত করে রাখতে হবে। পরে কাপড় দিয়ে মুখে বোতলগুলো সোজা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

কুলের চাটনি: কুল বাংলাদেশের একটি অন্যতম উৎকৃষ্ট ফল। এর ফল এবং পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী। কুল রক্ত শোধন, রক্ত পরিষ্কার ও হজমে সাহায্য করে। কুল থেকে উৎকৃষ্ট মানের চাটনি তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালি:

১। ভালো কুল বেছে নিয়ে বোঁটা ছাড়িয়ে পানিতে ধুয়ে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২। প্রয়োজনমতো নরম না হলে ভিজিয়ে রাখা পানি থেকে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।

৩। ঠান্ডা হলে কাঠের হাতল/হাত দিয়ে কচলিয়ে মন্ড করতে হবে।

৪। সকল মসলা ভেজে গুঁড়া করতে হবে।

৫। চিনি ও মন্ড এক সাথে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে।

৬। কিছুটা ঘন হলে সকল মসলা ও লবণ মিশিয়ে দিতে হবে।



৭। আরও ঘন হলে অ্যাসিটিক এসিড যোগ করতে হবে।

৮। অন্য একটি পাত্রে সরিষার তেল গরম করে চাটনিতে মিশাতে হবে।

৯। পুরোপুরি ঘন হলে সামান্য পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে চাটনিতে মিশাতে হবে।

১০। জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ঠান্ডা হলে উপরে মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিপি এঁটে সংরক্ষণ করতে হবে।

চালতার চাটনি: চালতার চাটনি সবার কাছেই খুবই মুখরোচক ও সুস্বাদু খাবার। শিশু, কিশোর এবং মহিলাদের কাছে এর চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় চালতা বুনো গাছ হিসেবে জন্মে থাকে। চালতাতে অনেক পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কচি ফল পেটের গ্যাস, কফ, বাত ও পিত্ত নাশক। পাকা ফলের রস চিনিসহ পান করলে সর্দিজ্বর উপশম হয়। চালতা চাটনি তৈরির মাধ্যমে নিজের চাহিদা মিটিয়েও বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রনালী:



১। পরিপক্ব চালতা নিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
২। আঙ্গুলের মতো টুকরা করে নিতে হবে।
৩। গর্ভাশয়, বীজ এবং অন্যান্য বর্জ্য ফেলে দিতে হবে।
৪। টুকরোগুলো ধুয়ে কড়াইতে সমপরিমাণ পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
৫। চালতা ঠান্ডা করে হাত দিয়ে কচলিয়ে গলিয়ে নিতে হবে।
৬। অধিকাংশ আঁশ (৮০% এর বেশি) ফেলে দিতে হবে।
৭। মসলাগুলো আলাদাভাবে ভেজে নিয়ে গুঁড়া করে চালতার পরিমাণ অনুযায়ী মেপে নিতে হবে।
৮। কচলানো চালতার পাল্পের সাথে পরিমাণমতো চিনি মিশিয়ে রান্না করতে হবে এবং ঘন ঘন নাড়তে হবে।
৯। যখন পাল্প ঘন হয়ে আসে তখন লবণ এবং গুঁড়া করা মসলা দিয়ে নাড়তে হবে।
১০। তারপর অ্যাসিটিক এসিড যোগ করতে হবে।
১১। যখন জ্বাল দেয়া পাল্প ঘন হয়ে আসে তখন সামান্য পানির সাথে গুলিয়ে প্রিজারভেটিভ হিসেবে সোডিয়াম বেনজয়েট মিশিয়ে এবং ১-২ মিনিট পর জ্বাল বন্ধ করতে হবে।
১২। জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ছিপি হালকাভাবে লাগিয়ে রাখতে হবে।
১৩। পরের দিন চাটনির উপর মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিপি শক্তভাবে লাগিয়ে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

আনারসের জেলি: আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি এবং সি থাকে। উৎপাদন মৌসুমে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ায় এবং পচনশীল বিধায় এর মূল্য কমে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। কিন্তু যদি আনারস প্রক্রিয়াজাত করা যায় তাহলে এর সংরক্ষণ কাল বেড়ে যায় বহুগুণে। যেমন আনারস থেকে উন্নতমানের জেলি তৈরি করা যায়। জেলি খুবই সুস্বাদু ও দেখতে আকর্ষণীয়।

প্রস্তুত প্রণালি:



১। পাকা আনারস ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে।
২। খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করতে হবে।
৩। টুকরোগুলো হাত দিয়ে চাপ দিয়ে পাল্প আলাদা করে নিতে হবে।
৪। পরিমাণ অনুযায়ী সকল উপকরণ নিতে হবে।
৫। পেকটিনের দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি মেপে নিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে।
৬। একটি সসপ্যানে পাল্প ও চিনি একত্রে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
৭। কিছু ঘন হয়ে আসলে অবশিষ্ট চিনির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে পাত্রে যোগ করে ভালোভাবে নাড়তে হবে।
৮। আরো ঘন হলে সাইট্রিক এসিড যোগ করতে হবে।
৯। জেলি তৈরি হয়ে আসলে সামান্য পরিমাণ পানির সাথে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
১০। জীবাণুমুক্ত বোতলে গরম অবস্থাতেই ঢালতে হবে। ঠান্ডা হয়ে আসলে উপরে মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিপি এঁটে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফল ও ফলজাত পণ্য। কাজেই ফলের আবাদ বাড়ানো ও বহুমুখী করা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য অনুকূল পরিবেশ বয়ে আনবে। ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের কথা বিবেচনা করলে, গাছে পরিপক্ব পাকা ফল নির্বাচন করা দরকার। উন্নতমানের প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য পেতে এ বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

কাঁচা আমের আমসত্ত্ব প্রক্রিয়াজাতকরণঃ

ছোট-বড় সবাই আমসত্ত্বের স্বাদে মুগ্ধ। কাঁচা বা পাকা আম দিয়ে তৈরি আমসত্ত্ব খেতে অনেক সুস্বাদু। কাঁচা বা পাকা আম দিয়ে সহজেই তৈরি করা যায় সুস্বাদু আমসত্ত্ব। এটি তৈরি করা খুবই সহজ।



উপকরণ

১. কাঁচা আম ২টি
২. চিনি ১ কাপ
৩. বিট লবণ আধা চা চামচ
৪. তেজপাতা ১টি
৫. কাঁচা মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ
৬. পাঁচ ফোড়ন, শুকনো মরিচ ভেজে গুঁড়ো করা ১ চিমটি
৭. পানি পরিমাণমতো

পদ্ধতিঃ

প্রথমে আমের খোসা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিয়ে তারপর সামান্য পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে। বেশি পানি যেন না থাকে। গরম থাকাকালীন একটি ঝাঝরির সাহায্যে সেদ্ধ আমগুলো ম্যাশ করে নিন। তারপর একটি প্যান গরম করে তাতে সেদ্ধ আমের পাল্প ও চিনি ঢেলে দিন। ভালো করে নেড়েচেড়ে বাকি সব শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে মাঝারি আঁচে ক্রমাগত নাড়তে হবে। এবার একটি স্ট্রিলের বড় প্লেটে সরিষার তেল মাখিয়ে রাখুন। নাড়তে নাড়তে যখন দেখবেন আমসত্ত্বের মিশ্রণ খুন্তির সঙ্গে একেবারে লেগ থাকবে বা আঁঠালোভাব হবে; তখন নামিয়ে নিন।

এবার প্যান থেকে পেল্টে ঢেলে নিন। প্লেটটি ধরে একটু ঘুরিয়ে নিন, যাতে যাতে সমানভাবে ছড়ায়। এবার কড়া রোদে রেখে টানা ২দিন শুকিয়ে নিতে হবে। ২দিন পর দেখবেন আমসত্ত্বেবর রং অনেকটা কালচে খয়েরি হয়ে গেছে। এরপর ছুরি দিয়ে কেটে একটি কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করুন। দীর্ঘদিন ভালো রাখতে মাঝে মধ্যে রোদে দিতে হবে আমসত্ত্ব।

পাকা আমের আমসত্ত্ব

উপকরণ

পাকা আম আঁটি ফেলে চটকে নিতে হবে। আর টক মিষ্টি খেতে চাইলে কাঁচা ও পাকা আম মিলিয়ে নেবেন। আমের তার সম পরিমাণ চিনি। সরিষার তেল প্রয়োজনমত।



প্রণালিঃ

- আম চটকে নিন ভালো মত। তারপর ব্লেন্ডারে দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন কোন পানি ছাড়া। আমে আঁশ থাকলে চালনি দিয়ে চেলে নেবেন।
- এবার একটি ভারি তলার কড়াইতে এই আম ও চিনি দিয়ে জ্বাল দিন। ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। আম থকথকে হালুয়ার মত হয়ে গেলে নামিয়ে নিন।

- এবার একটি বাঁশের কুলা বা ডালায় সরিষার তেল মাখিয়ে নিন। তার ওপরে এই জ্বাল দেয়া থকথকে আম হাত দিয়ে লেপে দিন। তারপর এই কুলা বা ডালাকে রেখে দিন চুলার নিচে! আপনি চাইলে রোদে দিতে পারেন, তবে যাদের বাসায় রোদের দেয়া সমস্যা তারা চুলার নিচে রেখে দিলেও চমৎকার আমসত্ত্ব হবে। চাইলে ওভেনেও কেক করতে পারেন। ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কেক করতে পারেন শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।
- আপনি চাইলে একটি লেয়ার শুকিয়ে গেলে ওপরে আরও একটি লেয়ার দিতে পারেন। এভাবে কয়েকটি করে লেয়ার দেয়া যায় প্রত্যেকটি লেয়ার দেয়ার পরই ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- শুকিয়ে গেলে তুলে ফ্রিজে বা এয়ার টাইট কৌটায় ভরে সংরক্ষণ করুন।

কাচা আমের মোরব্বা:

বাজারে যখন কাচা আম পাওয়া যায়। এই সময়টাতেই নানা স্বাদের মোরব্বা বানিয়ে সারা বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

উপকরণ:

বড় কাচা আম ১০টি, চিনি ২ কাপ, পানি ১ কাপ, ফিটকিরি গুঁড়া ১ চা চামচ, এলাচ ৩টা, দারুচিনি ২ টুকরো, তেজপাতা ২টা, চুন ১ চা-চামচ, লবন স্বাদমতো।

পদ্ধতি:



প্রথমে আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। তারপর আম ২ টুকরা করে কেটে নিন। আঁটি ফেলে আম পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। কাঁটা চামচ দিয়ে আমগুলো ভালো করে কেচে নিন। এরপর আমগুলো আবার পরিষ্কার পানিতে রাখুন।

এভাবে ঘণ্টাখানেক পরপর ২-৩ বার পানি বদলে নিন। পরিষ্কার পানিতে চুন ও ফিটকিরি গুনিয়ে নিতে হবে। চুন ও ফিটকিরি গোলানো পানিতে ৩ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন আম।

এবার পানি থেকে আমগুলো তুলে ফুটানো পানিতে জ্বালিয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। অন্যদিকে চিনিতে পরিমাণমতো পানি দিয়ে সিরা তৈরি করুন। সিরায় আমসহ সব কিছু দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন। চিনি থেকে পানি শুকিয়ে আমের গায়ে আঁঠালোভাব এলে নামিয়ে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন আমের মোরব্বা। ফ্রিজে রেখে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন এই মোরব্বা।

সজনে পাতা গুড়া:

সজনে গাছে সব সময় আমাদের দেশে ২-৩ প্রকার সজিনা পাওয়া যায়। বসতবাড়ির জন্য সজিনা একটি আদর্শ সবজি গাছ।

প্রনালি:

- সিজনের সময় সজনে পাতা সংগ্রহ করে ডাল থেকে পাতাগুলো ছড়াতে হবে।
- ভালো ভাবে পাতা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- রোদে শুকাতে হবে।
- শুখনো পাতা ব্লেন্ডার মেশিন অথবা শিল পাটার সাহায্যে গুড়ো করতে হয়।



এটা ছয় মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সারা দিনে যে পুষ্টি দরকার তা এক থেকে দুই চা চামচ সজনে পাতা গুঁড়ায় যথেষ্ট। এ জন্য এটাকে অলৌকিক পাতা বলা হয়ে থাকে। সজনে পাতা ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, ওজন কমায়, যৌবন ধরে রাখে, হার্ট সুস্থ রাখে।

রোস্টেড কাজুবাদাম তৈরিঃ



উপাদনঃ

১. তিন কাপ আনসল্টেড কাজুবাদাম।
২. একটি ডিমের সাদা অংশ (অল্প বিট করে নেওয়া)।
৩. তিন চা চামচ মরিচ গুঁড়া।
৪. দুই চা চামচ জিরা গুঁড়া।
৫. দুই চা চামচ চিনি।
৬. স্বাদমতো লবণ।

পদ্ধতিঃ

১. প্রথমেই ২৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ওভেন প্রি-হিট করতে হবে।
২. এবারে বড় একটি পাত্রে ডিম ও বাদাম একসাথে মিশিয়ে পনের মিনিট রেখে দিতে হবে। পনের মিনিট পর বাড়তি ডিম ছেঁকে ফেলতে হবে।
৩. ডিমমিশ্রিত কাজুবাদামে মরিচ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, লবণ ও চিনি দিয়ে চামচের সাহায্যে ভালোভাবে মাখাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে সবগুলো বাদামে যেন সমানভাবে মসলা মাখানো হয়।
৪. একটি বেকিং ট্রের উপরে কাগজ বিছিয়ে তার উপরে মসলা মিশ্রিত কাজুবাদামগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে। একটা বাদামের সাথে আরেকটা বাদাম যেন না লেগে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
৫. প্রি-হিটেড ওভেনে একই তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ মিনিট বেক করে বের করতে হবে। ঠান্ডা হলে কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের চাষ পদ্ধতি



প্রকাশনায়
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০।
ফোন ঃ +৮৮-০১৭১৪-০৬৩৩৬০
ই-মেইল ঃ esdobangladesh@hotmail.com
ওয়েবসাইড ঃ www.esdo.net.bd
ফেসবুক ঃ www.facebook.com/esdobangladesh